মার্চ ১৯৮৮

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : প্রাণের উদ্ভব

প্রাণের উদ্ভব : মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

'অণু' শব্দের অর্থ কি ? পরমাণুই বা কাকে বলে ? আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অজানা নয়। কিন্তু অক্টেন স শব্দটির অর্থ আমরা সবাই জানি কি ? ভিনিগার নানারকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয়। কিন্তু ভিনিগার যে একরকমের অ্যাসিড এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা। ম্যাগ্রোমিটার ও ম্যানোমিটার শব্দদুটি আজকাল আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। কিন্তু শব্দদুটির সঠিক ব্যবহার কি ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অনেক শব্দ আমরা শুনতে পাই—যার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানি না। এইরকম প্রায় ২৫০০ শব্দের চিত্রসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক অমরনাথ রায়। যে গ্রন্থ শুধু কিশোর কিশোরীদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহল মেটাবে। পঁচিশ টাকা

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায় সঙ্কলিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

আপনার ছেলেমেয়েদের আরও জানার কৌতূহল মেটাবে

একখণ্ডে সম্পূর্ণ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস

পঞ্চাশ টাকা

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সপ্তম বর্ষ একাদশ সংখ্যা
মার্চ 1988

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ ডুবুরীর সমস্যা ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও অভিযান ঃ যে জাহাজ চলে জলের তলায় ॥ প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায় 31

পড়াশোনা ঃ মজার অঙ্ক নিয়ে ॥ নন্দলাল মাইতি 38 ঃ ঐচ্ছিক রসায়নের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ অমরনাথ রায় 17 ঃ নাইট্রোজেন ॥ অমরনাথ রায় 52

পরিবেশ ও আমরা ঃ সাগরগভীরে সমুদ্র ॥ সৌরভ বাগচী 41

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ প্রাণের উদ্ভব ॥ মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত 19

কমপিউটারের কলাকৌশল ঃ কমপিউটার কি কি পারে ॥ সৌম্য মিত্র 15

জীবজন্তু ঃ ট্যাপা মাছ ॥ ধীরেন দত্ত 37

ধারাবাহিক রচনা ঃ নীলসাগরে রহস্য ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 33 ঃ বিজ্ঞানের ডাইরী ॥ বিমান বসু 9 ঃ স্থলদানব রহস্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন 27

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা ঃ জানা অজানা 6 ঃ পিরামেডের কথা ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 49 ঃ ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 51

ছড়া ঃ লিমেরিক ॥ সজল চক্রবর্তী 42

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ সডি কারনো ॥ বিবেক রায় 18

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ॥ নিত্য গোপাল বসু 47

ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী ॥ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার ও অনিল কর্মকার 12 ঃ আবিষ্কারের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 14 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট 55 ঃ বুদ্ধিসুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 56, 57 ঃ শব্দকুট ॥ শ্রীদাম সরকার 58 ঃ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান 58

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 ঃ বিজ্ঞান সমাবেশ 65 ঃ খেলাঘরের পাখা ॥ অপরাজিত বসু 59 ঃ ব্লিচিং পাউডার থেকে বিদ্যুৎ ॥ প্রদীপ কুমার করণ 59 ঃ মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 60 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 61

প্রতিযোগিতামূলক রচনা ঃ অরিন্দম দাস মাজী 50 ঃ ভুবনেশ্বর মণ্ডল 51 ঃ অংশুমান কর 53 ঃ দয়াময় মাজী 40

আগামী সংখ্যায়

সীমা সেন-এর
প্রচ্ছদ নিবন্ধ
আমাদের ভেষজ উদ্ভিদ

প্রধান সম্পাদক ঃ **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহসম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ঃ অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

সংশোধন ঃ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছড়া লেখকের নাম বিমলেন্দু'র পরিবর্তে 'বিমলেন্দ্র' পড়তে হবে।

বিজ্ঞানের ডায়েরী 'ডিসেম্বর

ডিসেম্বর, '87-এর 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিমান বসুর 'বিজ্ঞানের ডায়েরী'তে লুই পাস্তুর সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি যেজন্য বিশ্ববিখ্যাত ও আরো 3টি উল্লেখযোগ্য তথ্য বাদ পড়েছে।

সেগুলি হল ঃ—

পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক Anti Rabis Vaccine (A.R.V.) আবিস্কার করে জগৎবাসীকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

1865 সালে ফ্রান্সে গুটিপোকার মড়ক লাগলে রেশম ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, পাস্তুর গুটি পোকার মড়ক লাগার জন্য দায়ী জীবাণুকে চিহ্নিত ক'রে তার প্রতি-ষেধক আবিস্কার করেন।

জস্তু-জানোয়ারের অ্যানথ্রাক্স নামক এক ধরনের রোগ হয়, তিনি এই রোগের প্রতিষেধক হিসেবে এক রকমের টীকা আবিস্কার করেন।

বিজ্ঞানী পাউসেট-এর 'জীবাণুরা আপনা আপনিই জন্মায়'—এই ধারণা পাস্তুর ভুল বলে প্রমাণ করেন এবং দেখান, 'জীবাণু থেকেই জীবাণুরা জন্মায়।'

ঐ একই সংখ্যার 52 পৃষ্ঠায় অসীম মুখোপাধ্যায়-এর 'ল. সা. গু. ও গ. সা গু. প্রসঙ্গে-'এর সূত্র-2কে আরো স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে বোঝাতে লেখা উচিত—

বড় সংখ্যাটির বর্গ=সংখ্যাদ্বয়ের ল. সা. গু. ও গ. সা. গু-র গুণফল × সংখ্যাদ্বয়ের অনুপাতসূচক সংখ্যাদ্বয়ের বড়টি ÷ সংখ্যাদ্বয়ের অনুপাতসূচক সংখ্যাদ্বয়ের ছোটটি।

অনুরূপে—

ছোট সংখ্যাটির বর্গ হবে।

সুভাষচন্দ্র মজুমদার, পূর্ব কালিয়া নিবাস (পলতা) উত্তর 24-পরগনা।

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

আপনারা বলেছেন প্রথম তিনজনকে আগে আসার ভিত্তিতে পুরস্কার দেবেন। কিন্তু আমি থাকি বর্ধমান জেলার এক গ্রামে। যেখানে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পেঁছাতেই 6-7 তারিখ হয়ে যায়। তারপর পাঠাতে আবার তিন-চার দিন লাগে। শুধু আমি নয়, অনেক পাঠকেরই আমার মত অবস্থা। অনেকের কাছে পেঁছাতে 10-15 তারিখ হয়ে যায়। তাই আপনারা যদি সঠিক উত্তরদাতাদের লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার দেন তবে বাধিত হব। **তরুণ তপন গরাই,** মুসকরা পি. পি. ইনস্টিটিউশন বর্ধমান।

বলতে পারো কেন ?

ফেব্রুয়ারী মাসের 'K. J. B'-তে বলতে পারো কেন ? বিভাগে বালাসুরু দরদার পাড়ার নাজমুরজ্জান-এর প্রশ্নে ছিল B. M. R-এর পুরো নাম কি ? এতে আপনি এর উত্তর দিলেন বেস মেটাবলিক রেট (Base Metabolic Rate)। কিন্তু আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে (তারকমোহন দাসের IX-X-এর বইয়ে) B. M. R.-এর পুরো নাম বেসাল মেটাবলিক রেট (Besal Metabolic Rate) পড়ে এসেছি। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে কোনটি ঠিক হবে।

আমার মনে হয় বেস মেটাবলিক রেট না হয়ে বেসাল মেটাবলিক রেট হওয়ায় উচিত। **সুদীপ্ত সেনগুপ্ত,** পোঃ রামপুরহাট, বিবেকানন্দ রোড, জেলা—বীরভূম, পিন -731224, 'ভারতী ভবন'।

হিল বিক্রিয়া

আমি আপনাদের প্রকাশিত 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত 'ডিসেম্বর '87 সংখ্যায় তারকমোহন দাস মহাশয় ও সীমা সেন মহাশয়ার লেখা 'লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ' নামক পড়াশুনা বিষয়ক ক্যুইজটি পড়তে খুব ভালো লাগল। আর সেই সঙ্গে ক্যুইজটির একটি ত্রুটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা এই ক্যুইজের 5নং প্রশ্নে বলেছেন—'হিল বিক্রিয়া কাকে বলে ?' এর উত্তরে বলেছেন—'সালোকসংশ্লেষে জল অণুর বিশ্লেষণে H^+ ও OH^- আয়ন নির্গমন প্রথম লক্ষ্য করেন বৈজ্ঞানিক রবিণ হিল। তাই এই বিক্রিয়াকে 'হিল-বিক্রিয়া' বলে।

কিন্তু আমার যতটা বিশ্বাস—ইহা ঠিক নয়। লেখক-লেখিকা যা বলেছেন তাকে ফোটোলাইসিস বলে। আর এই ফোটোলাইসিসের ফলে ভেঙে যাওয়া OH^- আয়ন তৎপরতার সহিত হাই-ড্রোজেন পেরোক্সাইড (H_2O_2) গঠন করে, যাহা পরে জল (H_2O) ও অক্সিজেন (O_2)-এ ভাঙিয়া গিয়া অক্সিজেন আণবিক আকারে পরিবেশে মিশিয়া যায়। জল অণু ভাঙিয়া এই-ভাবে অক্সিজেন (O_2) উৎপাদনকে হিল বিক্রিয়া বলে।

$$2(OH) \rightarrow H_2O_2$$

$$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$$

ইংরাজী জৈব রসায়নবিদ্ রবিন হিল এই বিক্রিয়া দেখাইয়াছেন। তাই ইহা 'হিল বিক্রিয়া' নামে পরিচিত।

আমার ধারণা ভুল কি ?

অরবিন্দ বিশ্বাস, C/o শ্রীতড়িৎ কুমার বিশ্বাস, পলাশীপাড়া এম. জি. এস. বিদ্যাপীঠ, পলাশীপাড়া, নদীয়া।

পড়াশোনা

আমি আপনাদের জনপ্রিয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। February 1988, Page No. 28 Line 5 ভুল $1+\tan\theta=\sec^2\theta$ আমরা জানি

$\frac{OB}{OA}=\sec\theta$ এবং $\frac{AB}{OB}=\tan$

সুতরাং $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, দশম শ্রেণী। পালপাড়া, মেদিনীপুর, যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয়।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র

আমি 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত অক্টোবর-নভেম্বর '87 সংখ্যার এই পত্রিকায় শ্রীসোমনাথ ব্যানার্জী জানিয়েছেন যে শিশুশ্রীল কর্তৃক লিখিত 'উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুইলে মস্তিষ্কে পৃথিবীর চুম্বক মেরুর প্রভাব পড়ে' উক্তির সত্যতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু আমি শ্রীসোমনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে একমত নই। কারণ সম্প্রতি আমিও একটি পত্রিকায় পড়েছি যে 'উত্তরে মাথা রেখে শোয়া ক্ষতিকর। কারণ পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন 'তাড়িৎ চৌম্বকীয় অনুস্পন্দন' এ গবেষণারত মাদ্রাজের 'হেলথ্ সার্ভিসেস মেডিক্যাল সেণ্টার'-এর কয়েকজন বিজ্ঞানী।

সুমনকুমার সাধু, গ্রাঃ+পো—মানুষ মুড়িয়া, জেলা—সিংভূম (বিহার)।

D. N. A.'র উপাদান

সুব্রত কুমার ভাস্কর মহাশয় DNA-এর উপাদান সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেই সম্পর্কে কিছু বলার আছে। উনি অল্প কথায় DNA কি তা বেশ ভালই বলেছেন। কিন্তু DNA-এর বেস-গুলি বলতে গিয়ে উনি থাইসিনের উল্লেখ করেছেন। বেসটির নাম থাইমিন, থাইসিন নয়। তাছাড়া উনি শর্করা না বলে পেন্টোজ শর্করা বললে আরও বেশি ভাল হত। সমস্ত কথাই উনি বলেছেন তবে মইয়ের মত বাঁকানো পলিনিউক্লিয়টাইড দণ্ডদ্বয়ের অভিমুখ বিপরীত, উল্লেখ করা উচিত ছিল। মিউটেশনের জন্য DNA-কে দায়ী করার মত কোন কারণ আমার জানা নেই। মিউটেশনের ফলে DNA-এর গঠনের পরিবর্তন হয় মাত্র এবং মিউটেশনের জন্য দায়ী কিছু জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, কিছু জৈব প্রক্রিয়া, কিছু রশ্মির প্রভাব ইত্যাদি। এ ছাড়া বিবর্তনের জন্য মিউটেশন দায়ী, DNA নয়।

দ্বিতীয়ত, জীবজগতের বিচিত্র খবরে সদানন্দ অধিকারী মহাশয় যে কৃত্রিম ব্যাক্টেরিয়ার কথা বলেছেন সেই সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন। বিজ্ঞানীদল সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়া কি সর্বতোভাবে কৃত্রিম নাকি জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং পদ্ধতিতে ক্লোনিং-এর দ্বারা সৃষ্ট নতুন প্রজাতি?

সুদীপকুমার ঘোষ, Dept. of Biochemistry & Biophysics, Kalyani University, Kalyani, 741235.

পরিমিতির সূত্র

ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরমানাথ চক্রবর্তীর রচনার ভিত্তিতে যে সব ভুলের উল্লেখ করে চিঠিপত্র এসেছে, তার পরি-প্রেক্ষিতে লেখকের উত্তর ঃ

ফেব্রুয়ারী মাসের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 27 পাতায় পরিমিতির সূত্রতে কতকগুলি ছাপার ভুল রয়েছে।

(ক) (iii) তৃতীয় লাইনে

$\frac{a}{4}\sqrt{46^2-a^2}$ স্থলে $\frac{a}{4}\sqrt{4b^2-a^2}$ হইবে।

(ক) (v) দ্বিতীয় লাইনে

$S=\frac{a+b-c}{2}$ স্থলে $\frac{a+b+c}{2}$ হইবে

(খ) (iii) $\pi r-2r=r(\pi-2)$-এর স্থলে $\pi r+2r=r(\pi+2)$ হইবে

(ঙ) দ্বিতীয় লাইনে

$2x+y)$ স্থলে $2(x+y)$ হইবে।

দ্বিতীয় প্যারার তৃতীয় লাইনে

$(x+2ay+2a)$ স্থলে $(x+2a)$ $(y+2a)$ হইবে

(চ) দ্বিতীয় লাইনে বাহু হইবে না।

(ছ) দ্বিতীয় লাইনে cm C হইবে।

(ঝ (ii) দ্বিতীয় লাইনে

$2\pi rh+r)$ স্থলে $2\pi r(h+r)$ হইবে।

(ট) প্রথম লাইনে r=ব্যাসার্ধ হইবে।

(ট) (i) $\pi r\sqrt{h^2\times r^2}$ স্থলে

$\pi r\sqrt{h^2+r^2}$ হইবে।

(ii) $\pi r(l\times r)$ স্থলে $\pi r(l+r)$ হইবে।

রমানাথ চক্রবর্তী, শ্রীনগর পোঃ—লাভপুর, বীরভূম।

বায়ুর চাপ

'চিঠিপত্র' বিভাগে 'বায়ুর চাপ' শীর্ষক লেখাটি আমাকে আকৃষ্ট করল। সংখ্যাটিতে শিবাজী দাস, দিলীপ দাসের ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক গল্পটির বিরোধিতা করে কয়েক লাইনে লিখেছেন যে—'তাছাড়া আমরা এই চাপে অক্ষত রয়েছি তার কারণ অভ্যাস নয়, এই চাপ সবদিক হতে সমান দেয় বলে।'

কিন্তু আমার মতে বলে, এটি ভুল। উত্তরটি নিম্নলিখিত হবে—'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, প্রত্যেক জীবের শরীরের অভ্যন্তরীণ চাপ (internal pressure), বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপের (external pressure) সমান। এইজন্য একটি চাপ অপর চাপকে কার্যকর হতে দেয় না। আর এর ফলেই আমরা বায়ু-মণ্ডলের চাপ অনুভব করি না।

কৃষ্ণা আচার্য, C/o সতীনাথ আচার্য, লালবাগ মতিঝিল রোড, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, 742149।

জানা অজানা

কি করে টি ভি দেখবেন ?

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি নিম্নোক্ত সতর্কতাগুলি অবলম্বন না করেই অনেকে টি· ভি দেখেন। ফলে টিভি এবং স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়। তা হলে কি করে টি ভি দেখবেন ?

1. টিভি সেটটিকে ঘরের যেখানে সেখানে বসাবেন না। (ক) টিভি সেটের পর্দায় যাতে সোজাসুজি ভাবে কোন আলো এসে না পড়ে সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে টিভি সেটটিকে বসাবেন।

(খ) যেখানে বসে টিভি দেখবেন তার অপরদিকে ঘরের কোণে সেটটিকে বসাবেন। একেবারে দেয়াল ঘেঁষে বসাবেন না। কম করে দুই ইঞ্চি ফাঁক রাখবেন।

2. আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে কখনই টিভি দেখবেন না। (ক) টিভির ছবি যাতে চোখে না লাগে সেই অনুপাতে 40 বা 60 ওয়াটের ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে টিভি দেখবেন।

3. টিভি সেটের কাছাকাছি বসে কখনই টিভি দেখবেন না। (ক) বড় টিভি সেট হলে 5-6 ফুট দূর এবং ছোট টিভি সেট হলে 2-3 ফুট দূর থেকে টিভি দেখবেন।

4. অন অফ্ সুইচ অন করেই সঙ্গে সঙ্গে ভলুম বাড়াবেন না। (ক) সুইচ অন করে পর্দায় পুরো আলো না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। (খ) স্টেশন ব্যান্ড চেঞ্জ করুন। হরাইজেনট্যাল ও ভারটিক্যাল নব ঘুরিয়ে টিভির পর্দায় ছবিটি সেট করে নিন। (গ) কনট্রাস্ট ও ব্রাইট কন্ট্রোল নব ঘুরিয়ে পর্দার ছবিকে অন্ধকার ও ধোঁয়াটে ভাবমুক্ত করুন। (ঘ) এর পর প্রয়োজন সাপেক্ষে ভলুম বাড়ান। (ঙ) সব শেষে ফাইন টিউন নবটি ঘুরিয়ে ভালো শব্দ ও ছবি এ্যাডজাস্ট করে নিশ্চিন্তে টিভি দেখুন।

5. এয়ার কুলার ফ্রিজ, গ্যাস সিলিণ্ডার ও হিটারাদি যন্ত্র থেকে টিভি সেটটিকে সর্বদাই দূরে রাখবেন। (ক) এ সব যন্ত্রের ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্লাগ্ বা হোল্ডার এবং টিভির বুসটার সাপ্লাই প্লাগ্ বা হোল্ডার লুজ বা আলগা না থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

—গিরিশ রায় বর্মণ

প্রযত্নে—এইচ· কে. গুহ 232 নং বাড়ি—ভবানীপুর খড়্গপুর 721301

মুক্তার জন্ম

মুক্তার নামটির সঙ্গে আমরা ছোটবেলা থেকেই কি ভীষণ পরিচিত। রূপকথার গল্প শুনতাম।

এই মুক্তোর জন্ম পদ্ধতি কিন্তু বেশ মজার। সমুদ্রে থাকে বড় বড় ঝিনুক। ঝিনুক কেমন হয় তাতো আমরা সবাই জানি। দুটো শক্ত খোলা একটা নরম দেহকে আটকে রাখে আর সাদা হড়হড়ে এবং পিছলে মত একটা রস দেহটাকে ভিজিয়ে রাখে সব সময় যাতে কিনা ঐ শক্ত খোলাতে দেহটা ঘষটে না যায়।

অনেক সময় ঝিনুকের মধ্যে বালুকণা ঢুকে যায় আর একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। তখন ঐ সাদা হড়হড়ে রসটা যার নাম ন্যাকরে (nacre) ঐ বালুকণার চারদিকে বারবার জমতে থাকে। বালুকণাটিকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে একটা আবরণ সৃষ্টি করে। তারপর সেটা লেগে যায় ঝিনুকের খোলার ভেতরে। তখন আর ঝিনুকের দেহে কোন অস্বস্তি হয় না। আর বালুকণাটি শুদ্ধ তার চারদিকে যে আবরণীর সৃষ্টি হল সেটিই হল মুক্তা।

—মানস কুণ্ডু

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ হস্টেল রহড়া 24 পরগণা

চিরন্তন যন্ত্র

উচ্চ আণবিক যৌথ ল্যাবরেটরিতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এমন একটি উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যা ঘর্ষণ হ্রাস করে, যা তৈলাক্ত করতে হয় না এবং যার কোন ক্ষয় নাই। এই নতুন উপকরণটি ব্যবহৃত হতে থাকলে কালক্রমে যন্ত্রে তেল দেওয়ার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। গৃহস্থর প্রয়োজনেও উপকরণটি ব্যবহার করা চলবে।

লিডার স্টেশন

স্টেশনটিকে বলা হয় লিডার—লেসার রেডার থেকে। এতে আছে একটি বিকিরণের উৎস, একটি গ্রাহক, একটি রেকর্ডার ও অন্যান্য ব্যবস্থা। লেসার রশ্মির ফলকটি পড়ে বায়ুতে পরিব্যপ্ত ধুলো, ধোঁয়া ও জলকণার ওপরে এবং অংশত লিডারে ফিরে আসে। লব্ধ তথ্য একটি রেকর্ডারে লিপিবদ্ধ হয়। এমন লিডার স্টেশন লেনিনগ্রাদে প্রথম স্থাপিত হতে চলেছে। বায়ুর গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করা হয় বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এমনি ভাবে লিডার স্টেশনের সাহায্যে চারিদিকের বহু কিলোমিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকার বায়ুর গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

—মানস কুমার চিনি

মেচেদা রেল কলোনী, মেদিনীপুর 721137

ডুবুরীর সমস্যা

সমরজিৎ কর

যদি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বলতো, দম বন্ধ অবস্থায় জলের মধ্যে ডুব দিয়ে কতক্ষণ থাকতে পারো ?

জানি, প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া শক্ত। অনেকেই তোমরা ডুব সাঁতার দাও। সেই জলে ঘড়ি দেখে কে কতক্ষণ ডুবে থাকতে পারে কেই বা দেখে, বলো ?

তা ঠিক। আসলে প্রসঙ্গটা ডুবুরীদের নিয়েই তুললাম। যেমন ধরো না, আমাদের 'বোম্বে হাই' ? ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে কিছুটা দূরে আরব সাগরের নিচে গভীর কূপ খনন করে চলছে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহের কাজ। সেই তেল এবং গ্যাস উপকূল পর্যন্ত নিয়ে আসতে বসান হয়েছে শত শত কিলোমিটার দীর্ঘ নল, জলের নিচে। তাদের বসান এবং মেরামতির জন্যে নানা রকম যন্ত্র ব্যবহার করলেও, সে কাজে ডুবুরীরও সাহায্য নিতে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও চলছে সমুদ্র নিয়ে গবেষণা। চলছে সমুদ্রের তলা এবং সেখানকার ভূস্তর থেকে নানা রকম ধাতু সংগ্রহের চেষ্টা। সমুদ্রের গভীরে উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিষয়ক গবেষণাও চলছে। এ সব কাজেও দরকার ডুবুরীর। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আমাদের নৌসেনা বিভাগ। গোয়ার রাজধানী পানাজির এক প্রান্তে দোনা পাউলা—সেখানকার ভারতীয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগারেও তার ব্যবস্থা রয়েছে।

কাজটা কিন্তু খুব কঠিন। বিপজ্জনকও। বড় সমস্যা, শ্বাস-প্রশ্বাস চালানর ব্যাপারটা। দেখা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে দম বন্ধ করে দুই মিনিটের বেশি জলের নিচে ডুবে থাকা সম্ভব হয় না। আর তার জন্যেই দরকার প্রশিক্ষণ। তবু এইভাবেই কাজ চালিয়েছে সে দীর্ঘকাল। পরে মুখোশের ব্যবস্থা করা হয়। মুখোশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় একটি নল। নলের একটি দিক থাকে মুখোশের সঙ্গে লাগান, আর একটি দিক থাকে জলের উপর। ফলে জলে ডুব দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানটা কিছুটা সহজ হয়। কিন্তু এর পর দেখা গেল আর একটি সমস্যা। প্রতি 10 মিটার গভীরতায় জলের চাপ বাড়ে 1 বার (bar)। সমুদ্র পৃষ্ঠে বাতাসের চাপ 1 বার। তাই মানুষ যতই গভীরে নামে, তার সারা দেহের উপর জলের চাপও থাকে বাড়তে। সেই চাপে বেরিয়ে আসতে থাকে দেহ-কোষের সঞ্চিত গ্যাস। এ ছাড়াও কানের পর্দায় পড়ে চাপ। কানে এবং 'সাইনাসে' প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। অনেকে ডুব দিয়ে উঠে আসার পর শ্রবণ-ক্ষমতা হারায়। কারোর কারোর হাত পায়ের গাঁটে ব্যথা ধরে। এ ছাড়াও গভীর জলে থাকার সময় জলের চাপে বুকের সম্প্রসারণ বাধা পায়। এতে করে শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়। আরো কত রকমই না সমস্যা।

অসুবিধেটি দূর করার জন্যে নলের বদলে চল হলো বাতাস পূর্ণ সিলিণ্ডার। সেই সিলিণ্ডার পিঠে বসিয়ে কাজ শুরু করলো ডুবুরীরা। নলের বদলে বাতাস পূর্ণ সিলিণ্ডার ব্যবহার করায় জলের ভেতর চলা ফেলার

সুবিধে হল। তবু তাতেও দেখা গেল সমস্যা। 50 মিটারের বেশি গভীরে নামলেই অকসিজেন শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়; বাতাসে মিশে থাকা নাইট্রোজেনের প্রভাবে কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; অতিরিক্ত চাপে বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

এ সব সমস্যার কথা ভেবে বিজ্ঞানীরা এখন অন্য রকম ব্যবস্থা চালু করেছেন। সিলিণ্ডারে এখন আর বাতাস নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় অকসিজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণ। এ ক্ষেত্রেও ডুবুরীদের জন্যে দু রকম ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মিক্সড্ গ্যাস বাউনস্ড ডাইভিং' (mixed gas bounced diving)। এক্ষেত্রে ডুবুরী তার পিঠের উপর অকসিজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণ নিয়ে সমুদ্রে 100 মিটার গভীরতা পর্যন্ত এক ঘণ্টা ধরে কাজ চালাতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্যাচুরেশন ডাইভিং' (Saturation diving)। এই পদ্ধতিটি কাজে লাগাতে হলে ডুবুরীকে প্রথমে নিয়ে আসতে হয় জাহাজের ডেকে। ডেকের উপর থাকে একটি কক্ষ। যার নাম 'ডেক্ কমপ্রেসন চেম্বার'। ডুবুরীদের এই কক্ষের মধ্যে কয়েকদিন রেখে দেওয়া হয়। কক্ষটির মধ্যে স্নান খাওয়া, ঘুমনো এবং ব্যায়াম করার ব্যবস্থা থাকে। আর সেই সঙ্গে যে গভীরতায় গিয়ে তাদের কাজ করতে হবে সেখানকার জলের চাপের সমান চাপ সৃষ্টি করা হয় বায়ুবন্ধ কক্ষটির মধ্যে। কয়েক দিন এই পরিবেশে থাকার পর তাদের শরীর ওই পরিবেশে কাজ করার মত উপযুক্ত হয়। এর পর থাকে আর একটি কক্ষ। তাকে বলা হয় 'বেল'। আগের কক্ষটির মধ্যে যতটা বায়ুচাপ থাকে, এই 'বেল' এর মধ্যেও থাকে সেই পরিণাম বায়ুচাপ। কাজের সময় 'বেল'-কে কমপ্রেসার চেম্বারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় একটি নলের মাধ্যমে। ডুবুরীরা সেই নলের ভেতর দিয়ে এসে ওঠে 'বেল'-এর ভেতর। ওঠার পর 'বেল' এর অর্গল বন্ধ করে কেব্‌লের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রে। নিজের ভারে 'বেল' কাজের জায়গায় গিয়ে পেঁছানর পর অর্গল খুলে বাইরে বেরিয়ে তখন ডুবুরীরা শুরু করে তাদের কাজকর্ম। অবশ্য, হ্যাঁ, তাদের পিঠের সঙ্গে কিন্তু অকসিজেন-হিলিয়াম মিশ্রণের সিলিণ্ডারটি নিতে ভোলে না।

কাজের শেষে 'বেল' চড়ে আবার তারা ফিরে আসে জাহাজের ডেকে। সেখান থেকে নল-পথে এসে হাজির হয় 'কমপ্রেসন চেম্বারে'। সেই চেম্বারের মধ্যে থাকতে হয় কয়েক দিন। ওই সময় চেম্বারের ভেতরকার চাপ ক্রমে কমিয়ে নেওয়া হয়। অবশেষে অকসিজেন এবং হিলিয়ামের মিশ্রণ সরিয়ে তার মধ্যে পুরে দেওয়া হয় সাধারণ বাতাস। সাধারণ বায়ু চাপের মধ্যে আরো কিছু সময় থাকার পর তাদের ওই চেম্বারটি থেকে বের করে নেওয়া হয়। এতে করে ডুবুরীদের দৈহিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কম।

এত সব করার পর সমস্যাটি পুরোপুরি মেটান গেছে, সে কথা বলবো না। সাধারণ বাতাসে প্রধানত থাকে অকসিজেন এবং নাইট্রোজেন। আগেই বলেছি, সমুদ্রের যত গভীরে যাওয়া যায়, জলের চাপ বাড়ে। ফলে চাপ বাড়ে বাতাসেরও। ওই অবস্থায় অকসিজেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। ডুবুরীদের মধ্যে দেখা দেয় খিঁচুনি। তাদের ফুসফুসে ঠিকমত রক্ত চলাচল করতে পারে না। চোখের রেটিনার শিরা-উপশিরার উপর চাপ পড়ে। দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। নাইট্রোজেনের দরুন শরীর অবশ হতে থাকে। মস্তিষ্ক ঠিকমত কাজ করতে পারে না।

নাইট্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম গ্যাস অকসিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে এসব উপসর্গ কমে যায় ঠিকই। তবে, দেখা গেছে হিলিয়ামের পরিবর্তে আর্গন, নিওন, ক্রিপ্টন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিলে আরো কিছুটা সুবিধে হয়। হিলিয়াম ডুবুরীদের কণ্ঠস্বর বিকৃত করে। কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়—কতকটা হাঁসের স্বরের মত। 200 মিটারের গভীরে গেলে দেখা দেয় আরো নানান উপসর্গ। গা বমি, মাথা ঝিমঝিম, হাত-পায়ে কাঁপন, এই সব। এ সব ব্যাপার ভেবে অকসিজেনের সঙ্গে হিলিয়াম, আর্গন এবং কিছুটা নাইট্রোজেন মিশিয়েও ডুবুরীদের শ্বাস কার্য চালানর চেষ্টা করা হয়। ডুবুরীদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে নানা রকম ওষুধও ব্যবহার করা হচ্ছে। এত সব করার পরও বিপদ এড়ান সব সময় সম্ভব হয় না। এক কথায় বলতে পারো, নিজের প্রাণ হাতে করেই ডুবুরীরা পালন করে তাদের দায়িত্ব। ঝুঁকি তাদের জীবনে থেকেই যায়।

সমরজিৎ কর প্রণীত

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কল-9

বিজ্ঞানের ডায়েরী—মার্চ

বিমান বসু

1 মার্চ 1966, আজ সোভিয়েত গ্রহযান ভেনেরা-3 (Venera-3) শুক্রগ্রহের ওপর অবতরণ করে। এটাই ছিল সৌরমণ্ডলের অন্য কোনও গ্রহের ওপর মানুষের তৈরি কোনও গ্রহযানের প্রথম অবতরণ। কিন্তু শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের প্রচণ্ড তাপ ও চাপের প্রভাবে গ্রহযানটির যন্ত্রপাতি নিমেষের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। তা থেকে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

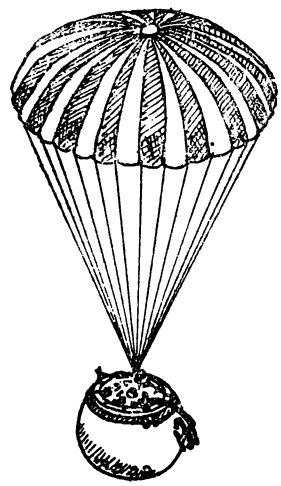

3 মার্চ 1972, এইদিন আমেরিকার পায়োনিয়ার—10 (Pioneer—10) গ্রহযানকে বৃহস্পতি অভিমুখে ছাড়া হয়। প্রায় 21 মাস পর, 1973 সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রহযানটিকে বৃহস্পতির 130,005 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গ্রহটির উত্তাল মেঘমণ্ডলের রঙীন ছবি তুলে পাঠায়। বৃহস্পতির প্রবল চৌম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্বও গ্রহযানটির যন্ত্রে ধরা পড়ে। তাছাড়া, বৃহস্পতির পথে পায়োনিয়ার—10-ই সর্বপ্রথম বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে গ্রহাণুপুঞ্জের কক্ষপথ অতিক্রম করে। 1983 সালের 13 জুন গ্রহযানটি সৌরমণ্ডলের সীমানার বাইরে চলে যায়।

5 মার্চ 1979, এইদিন আমেরিকার ভয়েজার—1 (Voyager —1) গ্রহযান বৃহস্পতির 350,000 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বহু রঙীন ছবি ও তথ্য পাঠায়। গ্রহযানটি থেকে পাঠানো ছবিতে সর্বপ্রথম বৃহস্পতির উপগ্রহ আইও (IO)-র ওপর সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। আরও দুটি উপগ্রহ গ্যানিমীড (Ganymede) ও ক্যালিস্টো (Callisto)-র খুব কাছ থেকে তোলা ছবিও গ্রহযানটি পাঠায়। ঐ সব ছবিতে বৃহস্পতিকে বেস্টন করে ক্ষীণ বলয়ও সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। বৃহস্পতির পর ভয়েজার—1 শনিগ্রহ অভিমুখে চলে যায়।

10 মার্চ 1876, এইদিন টেলিফোনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর পাঠানো হয়। আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) আমেরিকার বস্টন শহরে তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত যন্ত্রে সহকারী টমাস্ ওয়াটসন্ (Thomas Watson) কে উদ্দেশ্য করে প্রথম যে ক'টি কথা বলেন তা ছিল—'Come here, Watson, I want you।'

10 মার্চ 1977, আজ সর্বপ্রথম ইউরেনাস গ্রহের চারপাশে বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতের কাভালুর ও নৈনিতাল মানমন্দির সহ বিশ্বের কয়েকটি মানমন্দির থেকে সেদিন রাত্রে তুলারাশির একটি তারার সামনে দিয়ে গ্রহটির যাবার সময় একাধিক ক্ষীণ বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভয়েজার-2 গ্রহযান থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি থেকে জানতে পারা গেছে যে ইউরেনাসের দশটি বলয় আছে।

11 মার্চ 1955, পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার (Alexander Fleming) এইদিন পরলোক গমন করেন।

13 মার্চ 1781, এই দিন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। তাঁর নিজের তৈরি প্রতিফলক দূরবীনে মিথুন রাশির তারাগুলির অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি ইউরেনাসকে প্রথম দেখতে পান। যদিও তিনি প্রথমে তাকে একটি ধূমকেতু বলে মনে করেছিলেন, জ্যোতিষ্কটির কক্ষপথ গণনা করে জানতে পারা যায় যে সেটি একটি গ্রহ।

13 মার্চ 1929, এইদিন প্লুটো (Pluto)-র আবিষ্কার ঘোষণা করা হয়। আমেরিকার ফ্ল্যাগস্টাফ (Flagstaff) মানমন্দির সেবছর 23 এবং 29 জানুয়ারি তোলা ছবিতে প্লুটোকে খুঁজে বের করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ (Clyde Tombaugh)।

14 মার্চ 1879, এইদিন জার্মানির উল্ম (Ulm) শহরে পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)-এর জন্ম হয়। 1900 সালে সুইজারল্যাণ্ডে জুরিখের পলিটেক্নিক্ ইন্স্টিটিউট থেকে অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পাশ করার পর

বার্ন (Bern)-এ সুইস পেটেণ্ট দপ্তরে পরীক্ষকের কাজ নেন। অবসর সময়ে বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে 1905 সালে জুরিখ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। সে বছরই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চারটি গবেষণা পত্র লেখেন যেগুলির প্রত্যেকটিতেই এক একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা ছিল। 1955 সালের 18 এপ্রিল তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি (Institute for Advanced Study)-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

16 মার্চ 1926, এইদিন আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যের

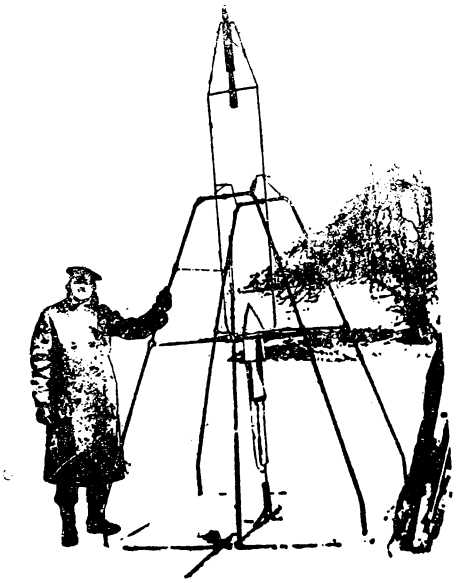

অবার্ন (Auburn)-এ বিশ্বের সর্বপ্রথম তরল জ্বালানীযুক্ত রকেটের সফল পরীক্ষণ করা হয়। পেট্রল ও তরল অক্সিজেন চালিত রকেটটি তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত রকেট বিজ্ঞানী রবার্ট গডার্ড (Robert Goddard)। মাত্র আড়াই সেকেণ্ডে রকেটটি 12·5 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত উঠেছিল।

18 মার্চ 1965, এইদিন সোভিয়েত মহাকাশচারী আলেক্সি

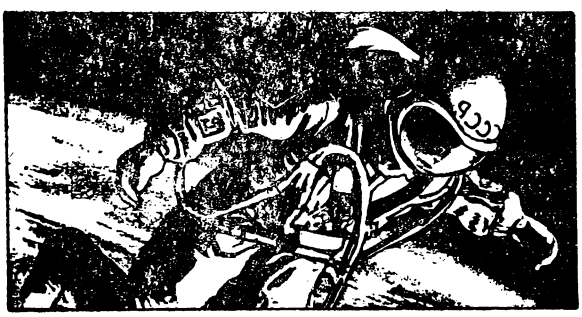

লিওনফ (Alexei Leonov) সর্বপ্রথম কক্ষপথে চলমান মহাকাশযানের বাইরে এসে শূন্যে বিচরণ (Space walk) করেন। প্রায় 10 মিনিট ধরে উন্মুক্ত মহাকাশে ভারশূন্য অবস্থায় বিশেষ ধরনের স্পেসসুট পরে বিচরণ করার সময় লিওনফকে মূল ভস্খড মহাকাশ যানের সঙ্গে লম্বা কেব্লের সাহায্যে জুড়ে রাখা হয়।

20 মার্চ 1933, জার্মানির কীল (Kiel) বন্দরে এইদিন সর্বপ্রথম রেডার (Radar) যন্ত্রের পরীক্ষা করে দেখা হয়। যন্ত্রটিতে 600 গজ দূরের একটি যুদ্ধপোত সহজেই ধরা পড়ে। এরপর জার্মানিতেই 1934 সালের অক্টোবরে আরও উন্নত ধরনের রেডার যন্ত্রে সাত মাইল দূরের জাহাজ ও এরোপ্লেনের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

20 মার্চ 1962, এইদিন প্রখ্যাত রসায়নবিদ ডাঃ বীরেশ চন্দ্রগুহ পরলোকগমন করেন।

23 মার্চ 1983, বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হৃদযন্ত্র রোপিত ব্যক্তি বার্নি ক্লার্কের এই দিন মৃত্যু হয়।

26 মার্চ 1972, এইদিন সোভিয়েত গ্রহযান ভেনেরা—8 (Venera—8)-কে শুক্রগ্রহ অভিমুখে ছাড়া হয়।

27 মার্চ 1845, এক্স-রশ্মির (X-rays) আবিষ্কারক উইলহেলম কনর্যাড রণ্টগেন (Wilhelm Konrad Roentgen) এইদিন জার্মানির Lennep শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 1866 সালে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। তারপর 1885 সালে উর্জবুর্গ (Wurgburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। এখানেই ফাঁপা কাঁচের নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের অধ্যয়ন চালাতে গিয়েই 1815 সালে তিনি এক্সরশ্মি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে 1901 সালে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 1900 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত রণ্টগেন মিউনিক (Munich) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে বিশিষ্ট অধ্যাপকের পদে ছিলেন। 1923 সালের 10 ফেব্রুয়ারি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

29 মার্চ 1974, এই দিন আমেরিকার মেরিনার—10 (Mariner—10) গ্রহযান বুধগ্রহের কাছে গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে গ্রহটির ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠায়।

7 ইউ এফ কলেজ রোড, নিউদিল্লী-1

প্রাণী বিচিত্রা – শৈল চক্রবর্তী

ম্যাজিক বাবুল

বরফ গলা কনকনে ঠাণ্ডা জলে বীভার নামক এই জীবটি থাকে। খানিকটা ভোঁদড়ের মত দেখতে তাকে। অনেক সময় সে বরফের চাঁই-এর ফাটলে আটকে পড়ে উপরে উঠতে পারে না। বাতাস তাকে নিতেই হবে। অক্সিজেন না হলে বাঁচবে কেমন করে। তাই সে করে কি মুখ দিয়ে একটা বাবুল বা ভুড়ভুড়ি তৈরি করে নেয়। সেটা বরফ জলের থেকে অক্সিজেন তৈরি করে নেয়।

আমরা জলের নীচে কতক্ষণ থাকতে পারি? এই বীভার কিন্তু একদমে ছ'মিনিট ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে বিপদেও পড়তে হয়, যখন ঐ বাবুলটা ফেসে যায় তখন তার খাদ্য তার পায় না।

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

যথাসময়ে কলম্বাস রাজসভায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু কই, তেমন অভ্যর্থনা তো তাঁর হোল না! রাজা জন তাঁকে বসতে পর্য্যন্ত বললেন না। এ কেমন ধারা ভদ্রতা?

গম্ভীর মুখে বক্তব্য রাখলেন রাজা জন—শোন কলম্বাস, অভিযানের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তোমার দরকার, তা ব্যয় করার মতো সাহস আমার নেই। তোমার ধারণা যদি ভ্রান্ত হয়, তখন কোথায় গিয়ে আমরা দাঁড়াবো, ভেবে দেখেছো? সবাই বলবে —একজন উন্মাদের কথা শুনে...

কী বলছেন মহান রাজা? স্বয়ং টসানেলী আমার সঙ্গে একমত। আমার মানচিত্রখানি তো দেখেছেন?

ওটা তোমার কল্পনা আর তুলি দিয়ে তুমি এঁকেছো —ব্যঙ্গ করে উঠলেন এক সভাসদ। তোমার ঐ মানচিত্র দেখে তো পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়নি। ঈশ্বর কি তোমার পরামর্শ নিয়ে এটা গড়েছিলেন?

কর্ণপাত করলেন না স্থিতধী কলম্বাস। আকুল কণ্ঠে বললেন—বিশ্বাস করুন রাজা। পৃথিবী বিশাল, তবু সে-ও তো আকারে সীমিত। এক অতিকায় গোলক। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের বিশালতা যতোই থাক, তার সীমা তো কোথাও আছেই।

হয়তো আছে, হয়তো নেই। কিংবা সেই দূরত্ব যদি তোমার ধারণার চেয়ে বেশী হয় তবে ফিরে আসতে কি কখনো পারবে? হয়তো মাঝসমুদ্রেই হারিয়ে যাবে সব জাহাজ, মানুষজন। পৃথিবীর কাছে তখন কেমন করে আমি মুখ দেখাবো বলো? সবাই বলবে —রাজা জন হঠকারী।

না না মহান রাজা। আপনি তো জানেন, এ বিশ্বাস রোমানদেরও ছিল। পশ্চিমমুখে আটলান্টিক অতিক্রম করা সম্ভব হলে মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে পদার্পণ করা সম্ভব।

তারাই যখন পারেনি তখন আমাদের শক্তি কতোটুকু? তোমার আঁকার হাত সুন্দর। বরং ঐ নিয়েই থাকো। কালে ঐ দিয়েই মানুষ চিনে নেবে তোমার প্রতিভা। এমন করে অজানার পথে পাড়ি জমানোর

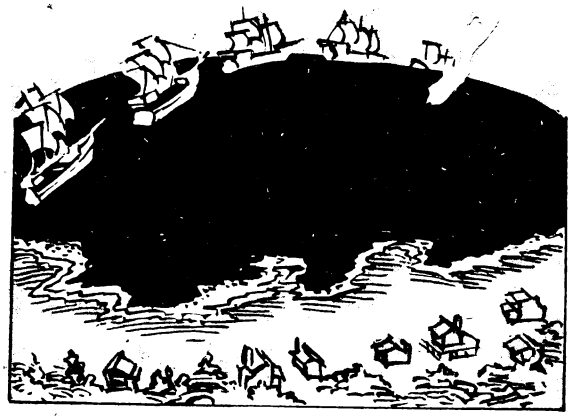

ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ ? যদি মাঝসমুদ্রেই একদিন শেষ হয়ে যাও ?

কলম্বাস আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ফিরে এলেন বন্দরের এক প্রান্তে তাঁর নিরিবিলি বসার জায়গাটিতে। চক্রবালে জাহাজের মাস্তুল ক্রমেই ছোট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী গোলকাকার। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী চাই ? তবু বিশ্বাস করতে কেউ চায় না। আটলান্টিকের পূর্ব সীমায় তিনি বসে আছেন লিসবনের মাটিতে। পশ্চিম সীমানায় অবশ্যই ভারতের ভূখণ্ড—হিমালয়ের গিরিপথ, সিন্ধু শতদ্রু বিপাশা অতিক্রম করে আর্যসভ্যতার গৌরবে বলীয়ান সুমহান ভারতবর্ষ।

দিনের পর দিন যায়। কলম্বাসের চোখের সামনেই একদিন ছোট্ট একটা জাহাজ যাত্রা করলো সমুদ্রে। কোনও বাণিজ্য-তরণী নয়, হয়তো কোনও নতুন দ্বীপের সন্ধানে। প্রিন্স হেনরীর অধীনে যেমন একের পর এক কতো নাবিক ভেসে গিয়েছে সমুদ্রে। কেউ নিয়ে এসেছে কোনও দ্বীপের খবর, কেউ ফিরে এসেছে ব্যর্থ। আবার কেউ বা উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে ফিরে এসেছে নতুন দ্বীপের মানুষ, তার ফল ফুল মাটি নিয়ে পোর্তুগালের বন্দরে।

আরও কিছু দিন গেল। হঠাৎ বন্দরে একটা কোলাহল শুনে কলম্বাস এগিয়ে গিয়ে দেখলেন - সেই জাহাজটি। অবাক হয়ে শুনলেন, নাবিকরা বলাবলি করছে—রাজা জনের মাথা খারাপ হয়েছে। কোথায় কার কথা শুনে গোপনে পশ্চিমমুখে আমাদের পাঠালেন। চলেছি তো চলেছি। কোথায় বা তীর আর কোথায়ই বা মাটি ? আরে মশায়, আটলান্টিক কি একটা ছোট-খাটো সাগর ? মহাসমুদ্র। যতো দিন যাচ্ছে ততো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সমুদ্র। আরও বেশী দূর আগালে আর দেশে ফিরতে হোত না। খুব বরাত জোর তাই বেঁচে ফিরেছি।

রাজা জন তোমাদের পাঠিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ হে, বলেছি তো। কিউটার বিশপ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, গোপনে অভিযান করে যদি নতুন দেশটা মিলে যায় তবে পোর্তুগালকে আর পায় কে ?

(চলবে)

সেলাই মেশিন

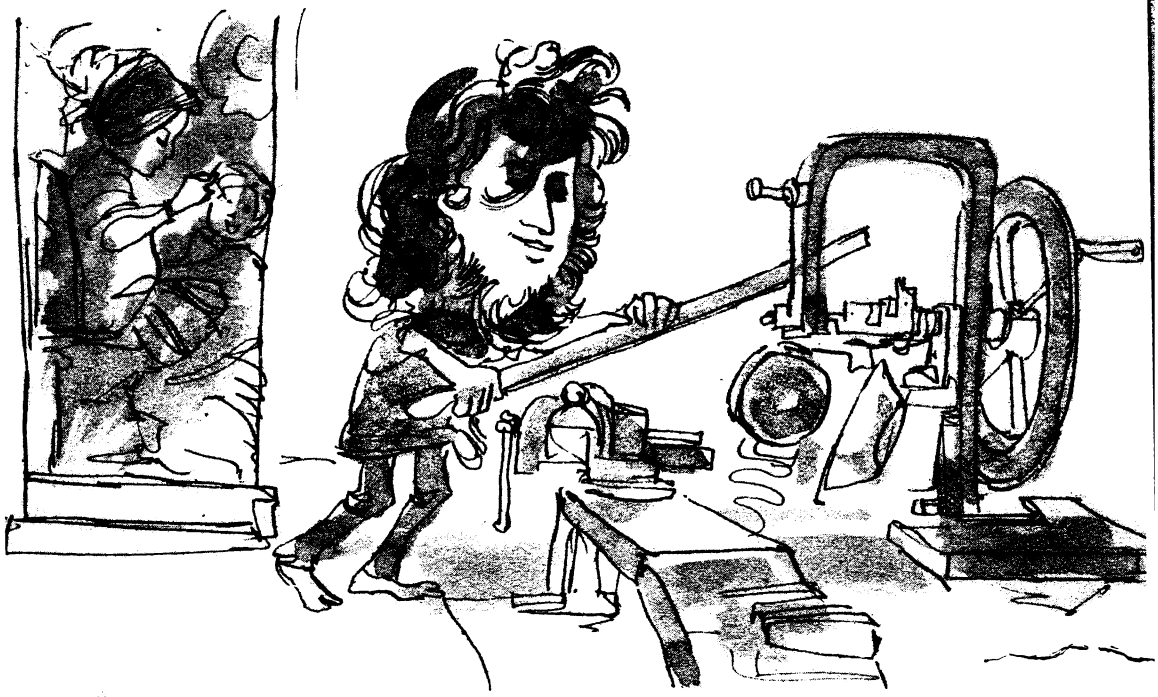

গত এক সপ্তাহ ধরে জিজার দেখা পাওয়া যায় নি। আজ সকালে হঠাৎ লাফাতে লাফাতে হাতে একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে আমার ঘরে হাজির। বলল, "দেখেছ ?" আমি বললাম, "কি ? নতুন ঝাড়ন ?" প্রচণ্ড রেগে গেল জিজা। বলল, "তুমি কি কানা, দেখতে পাওনা ? এটা আমার পুতুলের মিডি ফ্রক : ঐ জন্যেই তো তোমাকে ওরকম মোটা বাইসাইকেল চশমা পরতে হয়।" বুঝলাম, মোটর সাইকেল আর বাইফোকাল দুটোই জিজার মাথায় ভাল ঢুকেছে। গম্ভীর ভাবে টেবিলের ওপর কাপড়টা পেতে দুহাত দিয়ে পরিপাটি করে বোঝাতে লাগল জিজা কাকে হেম বলে, কোথায় কোণা মুড়তে হয়, রান দিতে হয় কখন,—এসব নাকি ও গত এক সপ্তাহ ধরে ঠাকুমার কাছে শিখেছে। আমি সমস্ত বোঝার পর বললুম, "এত সব তো বললি, এবার বলতো সেলাই মেশিন কে আবিষ্কার করেছে ?" জিজা বলল, "জানি।" ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলুম, "কে ?" কাপড়ের টুকরোটাকে ভাঁজ করতে করতে বলল, "পি টি. উষা।" আমি বললুম, "মানে ?" "সত্যিই তুমি দেখতে পাওনা", জিজা বলল, "দ্যাখনি, সেলাই মেশিনের ওপর লেখা থাকে।" অকাট্য যুক্তি। তবু··· ইলিয়েস হাও বলে এক গরীব ভদ্রলোক ছিলেন। সংসার চালানোর জন্যে তাঁর স্ত্রী রাত দিন সেলাই করতেন। তার সুবিধার জন্য মিঃ হাও সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন। সেলাই মেশিন পা দিয়ে চালানো যায় হাত দিয়ে চালানো যায়, আবার মোটরেও চলে। মেশিনে সুতো ভরা দুটো লাটিম থাকে, একটা ওপরে একটা নিচে। এগুলোকে ববিন বলে। ববিন থেকে ছুঁচের মধ্যে সুতো চালানো যায়। আর এইভাবেই সেলাই মেশিনে সেলাই হয়।

হঠাৎ জিজা ছুটে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল বুককেসের আড়ালে। আমি তো অবাক। অবশ্য তারপরই বুঝলাম ব্যাপারটা। জিজার ঠাকুমা ঘরে এসে ঢুকলেন, "হ্যাঁরে জিজাকে দেখেছিস ?" বললুম, "কেন বলতো ?" "আরে দ্যাখনা, পুতুলের জামা সেলাই করতে গিয়ে আমার মেশিনের সব কটা ছুঁচ ভেঙে রেখেছে। কোথায় গেল বলতো ?" আড় চোখে বুককেসের দিকে তাকিয়ে দেখি জিজা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমায় আপ্রাণ চুপ করতে বলছে।

জলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

কম্পিউটার কি কি পারে / সৌম্য মিত্র

কম্পিউটার কি করতে পারে আর কি না পারে বলতে শুরু করলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। যে সব কাজের কথা তোমাদের বললাম সে সব ছাড়াও এই মুহূর্তে আমি আমার কম্পিউটারের সাহায্যে একটা বড় সড় কোম্পানির হিসেব-নিকেশ খাতাপত্তর সামলাতে পারি, তোমার মানসিক এবং চারিত্রিক গঠন বিশ্লেষণ করে দিতে পারি। পাঁচ দিনে ছ কেজি ওজন কমাতে হলে কি কি খেতে হবে তার চার্ট তৈরি করে দিতে পারি, আধুনিক কবিতা লিখতে পারি, গানে সুর দিতে পারি এমন কি তোমাদের প্লেন চালানো পর্যন্ত শিখিয়ে দিতে পারি। একটুও বাড়িয়ে বলছিল, আমেরিকায় যে প্রোগ্রামের সাহায্যে পাইলটদের প্রাথমিক প্লেন ওড়ানো শেখানো হয়, সেই প্রোগ্রামটাই আমার কাছে আছে। ওটা চালালে কম্পিউটারের ভি ডি ইউতে একটি প্লেনের ককপিটের ছবি ফুটে উঠবে। সামনে তোমার কন্ট্রোল প্যানেল। তাতে একটি প্লেনে যতরকম যন্ত্রপাতি থাকে টার্ন অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ইণ্ডিকেটর, জাইরো কম্পাস, আর্টিফিসিয়াল হরাইজন, ইঞ্জিন ট্যাকোমিটার, অল্টিমিটার, এয়ার স্পিড ইণ্ডিকেটর, এ ডি এফ সবই রয়েছে আর সব কটি চলছে। সামনে দেখা যাচ্ছে রানওয়ে। প্লেনের থ্রটেল বাড়িয়ে প্লেনকে আকাশে তোলা যাবে। উঁচুতে উড়লে মেঘ আসবে। মাঝে মধ্যে হাওয়ার ঝাপটা আসবে। দিন গড়িয়ে বিকেল তারপর রাত্রি নামবে। বাইরের তাপমাত্রা কমবে। সবই একেবারে আসল প্লেনের মতো।

আর এসব কাজ ছাড়াও যদি তোমার অন্যান্য কাজ থাকে যেমন বাড়ির প্ল্যান তৈরি, পি. সি. বি ডিজাইন, ইলেকট্রিক সার্কিট ডিজাইন ইত্যাদি তাও অনায়াসে করা যাবে এর মাধ্যমে। এ ছাড়া তোমার নিজের ইচ্ছে মতো বিভিন্ন কম্পিউটার ল্যাংগোয়েজে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থা তো আছেই।

আর দেখেছো, কম্পিউটারের গুণগান করতে করতে সফটওয়্যার আর লোড শব্দের মানেটাই তোমাদের বলা হয়নি। সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের প্রোগ্রামের আর একটি নাম, আর কম্পিউটারে সেই সফটওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়াকে বলা হয় লোড (Load) করা। সফটওয়্যার লোড করার মূল ব্যাপারটি হলো কম্পিউটারের ভিতরে যে ইলেকট্রনিক স্মৃতি আছে। যাকে আমরা বলি প্রাইমারি স্টোরেজ (Primary Storage)। সেই স্মৃতিতে ওই সফটওয়্যারকে কপি করা। মূল সফটওয়্যারটি রেকর্ড করা থাকে ডিসকেটে। ডিস্ক ড্রাইভে ডিসকেট ঢুকিয়ে দিয়ে কম্পিউটারকে ওই প্রোগ্রাম লোড করতে বললেই কম্পিউটার ডিসকেট থেকে প্রোগ্রামটি পড়ে নিয়ে হুবহু তার কার্বন কপি প্রাইমারি স্টোরেজে করে ফেলে। এরপর তুমি ইচ্ছে করলে ডিসকেটকে তার বাক্সে ঢুকিয়ে রাখতে পারো কারণ কম্পিউটার তো এখন তার স্মৃতিতে সফটওয়্যারটি কপি করে নিয়েছে। এবার তুমি নির্দেশ দিলেই কম্পিউটার ওই কপি করা প্রোগ্রামটি পড়ে পড়ে বিভিন্ন কাজ করতে শুরু করে দেয়। যেমন ওই যে ক্যালেণ্ডার এবং অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যাপারটা বললাম, ওটাতো কম্পিউটার নিজে নিজে করেনি, কম্পিউটার চালু করার সময় Sidekick বলে একটা সফটওয়্যার লোড করে দিয়েছিলাম, সেই প্রোগ্রামটাই কম্পিউটারকে দিয়ে ওইসব কাজ করিয়ে নিয়েছে। এরপর যেই আমার কম্পিউটারকে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পরিণত করার দরকার পড়লো, অমনি আমি AMIGO নামে আর একটি প্রোগ্রাম লোড করলাম। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার টেলিফোন ডাইরেক্টরি হয়ে গেল!

এই রকম নানা রকম কাজের জন্য হাজার হাজার সফটওয়্যার প্যাকেজ কিনতে পাওয়া যায়। বড় বড় কাজের জন্য যে সব প্রোগ্রাম হয়, সে সব প্রোগ্রাম একটি ডিসকেটে ধরে না। সেগুলি অনেকগুলো ডিসকেটে রেকর্ড করে এক সঙ্গে বিক্রি হয় তাই আমরা সফটওয়্যারের সঙ্গে প্যাকেজ (Package) কথাটা জুড়ে দিই। এই প্যাকেজগুলিকে আবার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারও (Application Software) বলা হয়।

এই বই লিখতে আমি অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ ব্যবহার করেছি। যেমন বইয়ের যত ছবি সমস্তই আমি পাঁচটি আলাদা আলাদা ছবি আঁকার প্যাকেজের সাহায্যে কম্পিউটারের মাধ্যমে এঁকেছি। এগুলি হলো PC Paint Brush, Microsopt Picture Maker, Print Shop। Print master এবং News Room Pro। এছাড়া স্ক্রিনে ফুটে ওঠা লেখা বা ছবি ছাপানোর জন্য Microsoft Picture taker ব্যবহার করেছি। পরিশিষ্ট ইংরিজি বর্ণানুক্রমে সাজাতে কাজে লাগিয়েছি dBASEIII আর সেগুলি টাইপ করে সাজিয়েছি word-star 2000 প্যাকেজের সাহায্যে। ক্যালকুলেটর এবং ছোটো-খাটো নোট করার কাজে লাগিয়েছি Sidekick,

চাবি টেপার পরিশ্রম কমাতে Super key এবং এক সঙ্গে দুতিন রকম কাজের প্রোগ্রাম চালাতে ব্যবহার করেছি Microsoft window। কিন্তু যেহেতু এখনো বাংলা হরফের কম্পিউটার কী বোর্ড তৈরি হয়নি তাই সম্পূর্ণ বই লেখার কাজটি কম্পিউটারের মাধ্যমে করা গেল না। যদি যেতো তবে আমাকে বা প্রকাশক রবীন বাবুকে একটি কাগজ বা কলম নিয়েও কাজ করতে হতো না। যা লিখতাম তা সবই ডিসকেটে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতাম। একটি তিন ইঞ্চি ডিসকেটে অনায়াসে আটশো পাতার কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান সাইজের বইয়ের বিষয় বস্তু ধরে যায়। প্রকাশক মশাই তাঁর কম্পিউটারে ডিসকেট ঢুকিয়ে স্ক্রিনে লেখাগুলি ফুটিয়ে তুলে দেখে নিতেন। তারপর সেটি যেতো কম্পোজিং সেকশনে। নামেই কম্পোজিং সেকশন, কিন্তু সেখানে একটাও কালি ঝুলি মাখা টাইপ রাখার খোপ কাটা বাক্স খুঁজে পাবে না। এয়ারকন্ডিশান করা ফুল লতা পাতা সাজানো ঘরে রয়েছে একটি কম্পিউটার আর জেরক্স মেশিনের মতো দেখতে একটা যন্ত্র, যার নাম লেসার প্রিন্টার (Laser Printer)।

রিভলবিং গদি মোড়া চেয়ারে বসে কম্পোজিটার বাবু আরামসে খটাখট করে আমার লেখা পাণ্ডুলিপিকে বইয়ের পৃষ্ঠার জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে ফেললেন। ওনাকে কিন্তু এক লাইন লেখাও টাইপ করতে হলো না, ও কাজ তো আমিই করে দিয়েছি। এরপর জায়গায় জায়গায় উপযুক্ত ছবি ঢুকিয়ে দিলেন। ছবির মধ্যে যদি কিছু হাতে আঁকা ছবি বা ফটোগ্রাফ থাকে তাহলেও মুশকিল নেই। স্ক্যানার (Scanner) নামে একটা যন্ত্রে সেই ছবি ঢুকিয়ে দিতেই ছবির হুবহু কপি ভি ডি ইউ স্ক্রিনে চলে এলো। সব কিছু মনের মতো হলেই লেসার প্রিন্টারে নিখুঁত ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠা বেরিয়ে এলো। এই সম্পূর্ণ কাজকে বলা হয় ডেস্ক টপ পাবলিকেশন (Desk top Publication) বা সংক্ষেপে D.T.P। এই কাজের সফটওয়্যারকে বলা হয় DTP সফট্ওয়্যার।

শুনতে অবাক লাগলেও এই DTP কিন্তু আমাদের দেশেও খুব ব্যবহার হচ্ছে। শুধু প্রকাশকদের কাছেই নয়, অনেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাছেই DTP এখন অত্যন্ত কাজের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার নিজেরই তো DTP ব্যবহার করতে এতো ভালো লাগে যে আজকাল প্রায় বেশির ভাগ সচিত্র ইংরিজি লেখার কাজে DTP প্যাকেজ ব্যবহার করি।

শুধু বাড়ির আর প্রকাশকের কাজের জন্যই নয়, যে কোনো কাজে যেমন স্টক এক্সচেঞ্জের ভবিষ্যৎ বাণী থেকে শুরু করে বাচ্ছাদের A, B, C, D উচ্চারণ করতে শেখানো পর্যন্ত যাবতীয় যত রকম কাজ কল্পনা করা যায়। তার সবেতেই কম্পিউটারকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তবে কল্প বিজ্ঞান রচনাতে যেমন মানুষের মতো বুদ্ধিমান কথা বলা কম্পিউটার বা রোবটের বিবরণ পাওয়া যায়, তেমন কম্পিউটার তৈরির কথা এখনও কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের কল্পনার জগতেই সীমিত হয়ে আছে। কম্পিউটার যতই কাজের হোক না কেন, তার বিন্দুমাত্র চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। তাই কোনো একটা সামান্য কাজ তাকে দিয়ে করাতে হলে আমাদের তাকে পুংখানুপুংখ নির্দেশ দিয়ে দিতে হয়। যেমন 2+2 এর উত্তর কত হয় জানতে হলে কেবল কম্পিউটারকে 2 এর সঙ্গে 2 যোগ করতে বললেই চলবে না। তোমাকে বলতে হবে 2 এর সঙ্গে 2 যোগ করো। যোগ করার পর উত্তরটা স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোল। যদি স্ক্রিনে উত্তর লিখে দেবার কথাটি না বল, তবে কম্পিউটার মনে মনে যোগ করেই বসে থাকবে, উত্তর আর বলবে না। এ সব ব্যাপার অবশ্য আমরা পরে যখন কম্পিউটার প্রোগ্রাম করতে শিখবো তখন আরো ভালভাবে জানতে পারবো। এবারে বরং এই দারুণ কাজের যন্ত্রটি কিভাবে আবিষ্কার হলো তার কথাই জানা যাক।

এই শব্দগুলো মনে রেখো

Load—ডিসকেট বা সেই ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে কম্পিউটারের স্মৃতিতে প্রোগ্রাম কপি করার কাজ।

Mouse—কম্পিউটারের সঙ্গে লাগাবার জন্য তৈরি ছোট্ট একটা যন্ত্র। এর সাহায্যে খুব সহজে ভি ডি ইউ স্ক্রিনে ছবি আঁকা যায়। তাছাড়া ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়।

Real time clock—বর্তমানে সঠিক কটা বাজে তা কম্পিউটারকে জানান দেবার ব্যবস্থা।

Software—কম্পিউটার প্রোগ্রামেরই অপর নাম সফট্ওয়্যার।

Storage, Primary—কম্পিউটারের ভিতরে লাগানো ইলেকট্রনিক স্মৃতি ব্যবস্থা।

Word Processing—কম্পিউটারের মাধ্যমে চিঠি, লেখা ইত্যাদি টাইপ করে ছাপানো।

Scanner—হাতে আঁকা ছবি, লেখা বা ফটোগ্রাফকে কম্পিউটারের ব্যবহার যোগ্য ইলেকট্রনিক ছবিতে পরিণত করার যন্ত্র।

Printer—কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক ছাপার যন্ত্র। এর সাহায্যে কাগজের ওপর লেখা, ছবি সব ছাপানো যায়।

Laser Printer—লেখা আর ছবি উভয়ই নিখুঁতভাবে ছাপানোর জন্যও তৈরি বিশেষ দামী কম্পিউটার প্রিন্টার। এই প্রিন্টারে লেসার (Laser) রশ্মি ব্যবহার করা হয় বলে এর নাম Laser Printer।

D. T. P—ডেস্ক টপ পাবলিকেশন থেকেই D T P কেবলমাত্র একটি কম্পিউটার আর প্রিন্টারের সাহায্যে সচিত্র বই ছাপানোর ব্যবস্থা।

ঐচ্ছিক রসায়ন

1. (ক) 'বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ' এবং জল একটি যৌগিক পদার্থ"—এই উক্তির সপক্ষে দুইটি করিয়া যুক্তি দাও।

(খ) নিচের মিশ্রণগুলি হইতে কিভাবে উপাদানগুলিকে পৃথক করিবে?

*নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ

*লোহ চূর্ণ, বালি ও খাদ্য লবণের মিশ্রণ

*কপূর, গন্ধক ও চিনির মিশ্রণ

(গ) নিচের পদার্থগুলির মধ্যে কোনগুলি তড়িৎ বিশ্লেষ্য?

কেরোসিন তৈল, চিনি, নিশাদল, গলিত খাদ্য লবণ, গলিত কস্টিক সোডা।

(ঘ) প্রশমন ক্রিয়া ও নির্দেশক কাহাকে বলে। তোমার জানা দুইটি নির্দেশকের নাম লিখ। ডেসি নর্মাল দ্রবণ কাহাকে বলে? কস্টিক সোডার ডেসি নর্মাল দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হইলে কতো ওজনের কস্টিক সোডা প্রয়োজন হইবে?

(ঙ) বায়ু হইতে কিরূপে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিবে?

2. (ক) মৌলের তুল্যাংক ভার বলিতে কি বুঝ? দস্তার তুল্যাংক ভার কিরূপে নির্ণয় করিবে?

(খ) পারমাণবিক গুরুত্ব, তুল্যাংক ভার ও যোজ্যতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। বাষ্প-ঘনত্ব ও আণবিক গুরুত্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

(গ) চার্লস ও বয়েলের সূত্র সংযুক্ত করিয়া $PV=RT$ সম্পর্কটি নির্ণয় কর।

(ঘ) অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্পটি লিখ এবং উহার সাহায্যে প্রমাণ কর ঃ

* কোন গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব $= 2 \times$ বাষ্প ঘনত্ব

* প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় কোনও গ্যাস 22·4 লিটার আয়তন অধিকার করে।

3. (ক) গে-লুসাকের গ্যাসায়তন সূত্রটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর।

গুণানুপাত সূত্রটি লিখ ও ব্যাখ্যা কর।

(খ) অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যার মান কতো?

N.T.P তে 11·2 লিটার ক্লোরিন গ্যাসের ওজন কতো?

2 gm. Cu হইতে 2·50 gm. CuO পাওয়া যায়। কপারের তুল্যাংক ভার নির্ণয় কর।

300 ml $\left(\frac{N}{10}\right)$ NaOH এবং 250 ml (N) HCl দ্রবণে যথাক্রমে কতো গ্রাম করিয়া NaOH ও HCl থাকে?

(গ) জলের খরতার কারণ কি? জলের স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতা বলিতে কি বুঝ? স্থায়ী ও অস্থায়ী খর জলকে মৃদু করিবার জন্য একটি মাত্র পদ্ধতির বিবরণ দাও। খর জল বয়লারে ও লণ্ড্রীতে ব্যবহার করার অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

(ঘ) শমিত লবণ, অ্যাসিড লবণ ও ক্ষারকীয় লবণ কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও। ZnO কেন উভধর্মী অক্সাইড সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর। NO, CO_2 এবং CaO কি ধরনের অক্সাইড?

4. (ক) ক্লোরিন ও SO_2 এর বিরঞ্জন ধর্মের তুলনা কর। অনুঘটক কি? রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উহা কিভাবে কাজ করে? H_2SO_4 প্রস্তুতির স্পর্শ পদ্ধতির নীতি লিখ। এই পদ্ধতিতে কোন্ অনুঘটক ব্যবহার করা হয়। হেবার পদ্ধতিতে NH_3 উৎপাদন প্রণালী লিখ। এই পদ্ধতিতে কোন্ অনুঘটক ব্যবহার করা হয়?

(খ) কিভাবে প্রমাণ করিবে যে CO_2 তে কার্বন আছে? H_2S এ সালফার আছে, H_2SO_4 এ H আছে? পরীক্ষাগারে কিভাবে HCl গ্যাস, H_2S, CO_2 এবং SO_2 প্রস্তুত করা হয়?

(গ) কিভাবে নিম্নলিখিত গ্যাসগুলিকে শুষ্ক করিবে?
NH_3, HCl গ্যাস, H_2S

কি ভাবে নিম্নোক্ত পদার্থগুলিকে প্রস্তুত করিবে?

তুঁতে, প্লাস্টার অফ প্যারিস, কস্টিক সোডা ও গ্লবার সল্ট কি ভাবে অ্যামোনিয়া হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিবে?

(ঘ) টীকা লিখ ঃ

বহুরূপতা, বহির্দ্যুতি, পার অক্সাইড, অম্লরাজ, সংকর ধাতু, নিষ্ক্রিয় লোহ, তাপীয় বিয়োজন, প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া, বিপরিবর্ত ক্রিয়া, ব্লিচিং পাউডার, ফটকিরি। প্রতিটির একটি করিয়া ব্যবহার উল্লেখ কর।

5. কি ঘটে, সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর ঃ

NH_3 গ্যাস উত্তপ্ত CuO র উপর দিয়া পাঠানো হইল।

বিশুদ্ধ O_2 এর সহিত NH_3 র বিক্রিয়া।

দস্তাকে NaOH এর জলীয় দ্রবণে ফুটানো হইল।

তামার সহিত গাঢ় ও উষ্ণ H_2SO_4 এর বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

স্বচ্ছ চুন জলের ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ CO_2 গ্যাস চালনা করা হইল।

উত্তপ্ত লোহ চূর্ণের উপর দিয়া স্টীম চালনা করা হইল

H_2S এর সহিত Cl_2 এর বিক্রিয়া ঘটানো হইল

সোডিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ মিশ্রিত করা হইল।

$CuSO_4$ দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করা হইল।

উত্তপ্ত CuO এর উপর দিয়া H_2 গ্যাস চালনা করা হইল।

6. (ক) নিম্নোক্ত যৌগগুলিকে উত্তপ্ত করিলে কি পরিবর্তন ঘটিবে?

$AlCl_3, 6H_2O$; $Pb(NO_3)_2$; HgO

(খ) ক্লোরাইড এবং কার্বনেট মূলককে সনাক্ত করিবার জন্য একটি শুষ্ক ও আর্দ্র পরীক্ষা উল্লেখ কর।

(গ) কিভাবে তড়িৎ লেপন করা হয়? কিভাবে লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করা যায়? মরিচাহীন ইস্পাত কি?

(ঘ) তামা, দস্তা, লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের একটি করিয়া আকরিকের নাম ও সংকেত লিখ।

7. (ক) সলভে পদ্ধতিতে কিভাবে সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করিবে? স্বতঃ বিজারণ পদ্ধতিতে কি ভাবে ধাতব কপার নিষ্কাশন করিবে? জিংক অক্সাইড হইতে কিভাবে ধাতব জিংক প্রস্তুত করিবে? ক্যালসিয়াম ফসফেট হইতে বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কিভাবে ফসফরাস নিষ্কাশন করিবে?

(খ) নিচের যৌগগুলির মধ্যে কোনটি তড়িৎযোজী ও কোনটি সমযোজী তাহা লিখঃ

HCl, MgO, C_2H_6, MgO, H_2O, NH_3

(গ) উদাহরণ সহযোগে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। প্রমাণ কর যে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটে।

$N_2+3H_2=2NH_3$ সমীকরণটির তাৎপর্য ও অসম্পূর্ণতাগুলি লিখ। চিনির সহিত গাঢ় H_2SO_4 মিশাইলে মিশ্রণটি কালো হয় কেন?

(ঘ) সিন্দ্রির সার কারখানায় কিরূপে $(NH_4)_2SO_4$ উৎপাদন করা হয়? দস্তা লেপন কিভাবে করা হয়? কেন করা হয়? বিগলন, তাপজারণ ও ধাতুমল বলিতে কি বুঝ? কিভাবে বলয় পরীক্ষা করা হয়? এই পরীক্ষা দ্বারা কাকে সনাক্ত করা যায়? তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের একটি করিয়া ধাতু সংকরের পরিচয় দাও।

অমরনাথ রায়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

সডি কারনো (1768-1832)

যৌবন কালে সডি

সডি কার্নো (SADI CARNOT) ছিলেন এক খ্যাতনামা পদার্থবিদ ও প্রযুক্তিবিদ্। স্টীম ইঞ্জিন নিয়ে তিনি অনেক পড়াশুনা ও গবেষণা করেন এবং 'তাপগতিবিদ্যা' নামক বিজ্ঞানের এক শাখার গোড়াপত্তন করেন। তাপগতিবিদ্যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'থার্মো-ডায়নামিক্স', যার মূল কথা হলো তাপ সঞ্চালন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন 'নেপোলিয়ন' ছিলেন ফ্রান্সের শাসনকর্তা। অনেক ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে তখন ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল। 1815 খ্রীস্টাব্দে সম্রাট নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। সডির পিতা লাজারেকে তখন অজ্ঞাতবাসে পাঠানো হয়। সডি তখন চিন্তা ভাবনা করে দেখেন যে ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্যতম মূল কারণ হলো স্টীম ইঞ্জিন সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

সডি তখন এগিয়ে এলেন। তিনি অতিশয় কার্যকরী স্টীম ইঞ্জিন নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করলেন। সডি তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় স্টীম ইঞ্জিনের অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেন এবং তাপগতিবিজ্ঞানের প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃত হলেন।

—বিবেক রায়

এন. বি. টি. ৭৭এ, নিউট্রাফিক পোঃ ইন্দা (খড়্গপুর), জেলা মেদিনীপুর, পিন—721305

প্রাণের উদ্ভব

• সুনীলকান্তি দাশগুপ্ত •

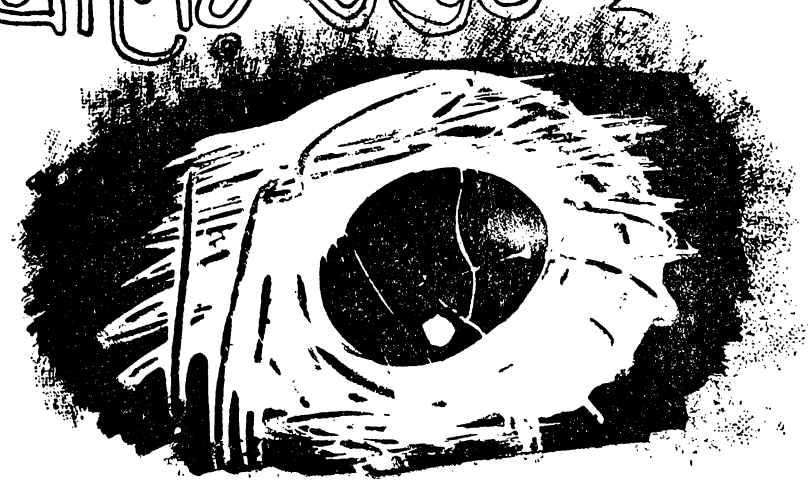

বহু প্রাচীন কাল থেকেই সভ্য মানুষ ভেবে এসেছে, পৃথিবীর বুকে প্রাণ এল কোথা থেকে। ঋক্ বেদের ঋষিও বলেছেন, 'আবভূত কুত ইয়ং বিসৃষ্টি' :—এই বিপুল সৃষ্টি কোথা থেকে এল। এনিয়ে দীর্ঘকাল জল্পনা-কল্পনা চলেছে। তারপর তার জায়গা নিয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান আর তাই নিয়ে তর্কাতর্কি। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে, সবাই মেনে নিয়েছে এমন একটা তত্ত্ব আজো তৈরি হয়নি ঠিকই কিন্তু মোটামুটি গ্রহণযোগ্য স্তরে পৌঁছুনো গেছে।

পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মমতগুলিতে মানুষের দার্শনিক চিন্তার আদি ধারণা প্রকাশ পায়। তাই নানান ভাবে যে মূল কথায় বিভিন্ন ধর্মে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হল, ঈশ্বর নিখিল বিশ্বের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। 1830 সালেও একজন যাজক 'যুক্তি' দেখাল যে 4000 বছর আগে মাত্র 6 দিনে পৃথিবী ও তার সমগ্র জড় ও জীবজগত সৃষ্টি হয়েছিল। এইরকম মতবাদের ভারিক্কি নাম হল Theory of Special Creation বা বিশেষ সৃষ্টির মতবাদ। এরপর যে দার্শনিক বা ধর্মীয় মতবাদ দেখা যায় তা হল Theory of Vitaliom বা প্রাণশক্তির মতবাদ। এতে অনুমান করা হয় যে, একটা অতিপ্রাকৃতিক প্রাণশক্তি থেকে পৃথিবীতে প্রাণ ও প্রাণের যাবতীয় বিচিত্ররূপের সৃষ্টি। উপনিষদ্ এই প্রাণশক্তিকেই বললেন ব্রহ্ম, গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল বললেন-Spirit।

এরপর মানুষের চিন্তার এরকম সহজ অনুমানের পরিবর্তে আর একটু জটিল অনুমান এল, একেবারে পুরোপুরি বিশ্বাসের বদলে এল খানিকটা বস্তুভিত্তিক দর্শন। সৃষ্টি ও জ্ঞানসংক্রান্ত এরকম দর্শনকে বলে অধিবিদ্যা বা metaphysics। পুরোনো আর নতুন মিলিয়ে এরকম ধরনের তিনটি মতবাদ আছে। এদের প্রথমটির নাম নিখিল বীজের তত্ত্ব (Panspermia) বা প্রাণের নিখিল উৎসের তত্ত্ব (Theory cosmic origin)। এই অনুমানে ধরেই নেয়া হল যে, নিখিল বিশ্বে প্রাণ চিরকালই আছে। বলা বাহুল্য, সেই 'প্রাণ'ই যে কোথা থেকে এল, তা বলা হল না। শুধু বলা হল, এই চিরকালীন প্রাণ উল্কাপিণ্ড বা ধূমকেতু দিয়ে, বা কোনো অজানা জীবের পরিকল্পনার বা অন্য কোনো অজানা উপায়ে বীজ, স্পোর, বা ব্যাকটেরিয়া হিসেবে পৃথিবীতে এসে গেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটির বৈজ্ঞানিক সারবস্তু আর একটু বেশি। এটির নাম বিপর্যয় তত্ত্ব (Theory of catastrophiom) এই মতের প্রবক্তা ছিলেন ভূ-বিজ্ঞানী ক্যুভিয়ের Couvier (1769—1832)। পৃথিবীর ভূ-বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে কিছু বিপর্যয়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার জীবের বিবর্তনের হিসেবনিকেশ করে অনেক সময় দেখা যায় যে,

বিপর্যয়ের আগের জীবের সঙ্গে পরের জীবের সংযোগ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এগুলোকে বলে missing link. ক্যুভিয়ের এই দুই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করলেন যে, এক একটা ভূ-বিপর্যয়ের পর জীবকুল নতুন ভাবে সৃষ্ট হয়েছে। গত 250 মিলিয়ন বছরে এরকম আটটি বিপর্যয় ঘটেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে শেষেরটা ঘটেছে 65 মিলিয়ন বছর আগে। আর তাতেই তখনকার উদ্ভিদকুল শেষ হয়ে গেছে। [এরকম ধ্বংসের অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে। যেমন, ডিনোসার শেষ হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাখ্যা হল যে, এইসময় পরাগরেণুযুক্ত উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছিল এবং রেণুর অ্যালার্জিতে ডিনোসাররা শেষ হয়ে গেছে।] জনৈক অধ্যাপক বলেছেন, 1998 সালেই নাকি আর একটা বিপর্যয় আসছে! তাহলে তারপরে যদি কেউ বেঁচে থাকে তবে তাঁরা ভাল মীমাংসা করতে পারবেন।

তৃতীয় তত্ত্বটি হল নিখিল বীজতত্ত্বের আধুনিক সংস্করণ বা Neo-Panspermia। আধুনিক কালে এই তত্ত্বের সবচেয়ে জোরদার প্রবক্তা হলেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী Sir fred Hoyle। 1982 সালে তিনি বলেন যে, জৈবনিক বস্তুগুলি এত জটিল যে রাসায়নিক বিবর্তনের ফলে সেগুলি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। উল্কাপিণ্ডে যে সব জটিল কার্বন যৌগ পাওয়া যায় সেগুলি কিভাবে উদ্ভূত হল তার কোনো ব্যাখ্যাও নেই। অতএব, তিনি অনুমান করলেন যে, কোনো উন্নততর জীব কোনো বিপর্যয়কালে প্রাণের বীজ রক্ষার জন্য পৃথিবীকে বেছে নিয়েছিল। এই তত্ত্ব প্রমাণ যেমন করা যায় না, ভুল বলে দেখিয়ে দেয়াও অসম্ভব। কেবল বলা যায়। এ খুবই কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু আজও বিজ্ঞানীরা খুঁজে চলেছেন উল্কাপিণ্ডে, ধূমকেতুতে, অন্যগ্রহে, অন্য নক্ষত্র জগতে কোথায় কি জৈব যৌগ আছে, প্রাণের উপস্থিতির অন্য কোনো প্রমাণ আছে কিনা ইত্যাদি। অজানাকে জানতেই হবে।

কল্পনানির্ভর অনুমানের পর শুরু হয়েছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দেয়ার পর্ব। অবশ্য এই ধরনের তত্ত্বেও প্রথমদিকে ছিল সাত মন কল্পনায় এক ফোঁটা বিজ্ঞান। আরিস্ততল ছিলেন ইয়োরোপের দর্শনবিজ্ঞানের গুরু। তাঁর 'Spirit' (সারবস্তু) আর 'matter (বস্তু) এই দু'য়ে মিলে প্রাণ এই সরল চিন্তাটি মধ্যযুগের বিজ্ঞানীদের অনেকের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছিল। তাঁরা অনুমান করতেন যে, নীলনদের কাদা থেকে সাপ, আবর্জনা থেকে ইঁদুর, অন্ধকার ঘরে ভেজা বস্তা থেকে পোকা, জলাশয়ের ধারের গাছের পাতা জলে পড়ে মাছ—এইসব উদ্ভূত হয়েছে। এখন এইসব 'কল্পবিজ্ঞান' শোনালে বিপদের সম্ভাবনা! কিন্তু তখনকার যুক্তিবাদীরা এইসব কল্পনার বিরুদ্ধে যে-সব পরীক্ষা হাজির করতেন তা আরিস্ততলপন্থী স্বয়ম্ভূ

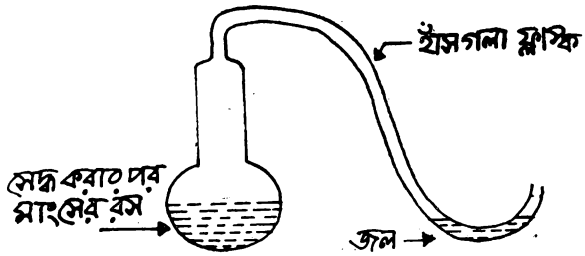

চিত্র নং 1 : পাস্তুরের পরীক্ষা

আবির্ভাবতত্ত্বের (Theory of spontaneous generation) প্রবক্তারা ভুল বলে উড়িয়ে দিতেন। নিখুঁত পরীক্ষা হাজির করলেন 1862 সালে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)। তিনি দেখালেন যে, জাল-দেয়া মাংসের রস (broth)-এর সঙ্গে বাতাসের সংযোগ (অর্থাৎ তথাকথিত spirit ঢোকার সুযোগ) থাকা সত্ত্বেও তাতে জীবাণু না আসতে দিলে মাংসের রস গাঁজিয়ে যায় না, অর্থাৎ তাতে জীবাণুর উৎপত্তি হয় না। সুতরাং জীবাণু থেকে জীবাণু আসছে (চিত্র 1)। পাস্তুর বললেন, Omni Vivus ex Vivus—Life begets life—জীব থেকে জীব উদ্ভূত হয়। তখনকার মত নিষ্পত্তি হল যে, জড় থেকে জীবের উৎপত্তি হয় না। উদ্ভট অনুমানকারীদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হল। আধুনিক পরিভাষায় পাস্তুরের তত্ত্বের নাম হল জীবজনি (bogenesis)। কিন্তু আমরা ফিরে এলাম সাপ লুডোর ছকের গোড়ার ঘরে—তাহলে আদিম জীবেরা কি করে এল? পাস্তুরের পরীক্ষার নতুন মূল্যায়ন হয়েছে। আমরা এখন বুঝতে পারি, তাঁর পরীক্ষার শর্ত ও ভৌত পরিবেশে জড় থেকে জীবের উৎপত্তি হয় না ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর আদিম পরিবেশে হতেও ত পারে।

হাঁস গলা ফ্লাস্ক (goose-neck flask) মুখ খোলা হয়েছে। সুতরাং 'spirit' ঢুকতে পারছে না তা বলা যাচ্ছে না। আসলে জল থাকায় বাতাস থেকে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে জলেই আটকে রইল, মাংসের রসের সঙ্গে মিশতে পারল না।

এর পরেও বৈজ্ঞানিকরা একটা বড় মাপের অনুমান করলেন। সুদূর অতীতে কোনো আকস্মিক ঘটনার ফলে হয়ত নিজের অবিকল প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে এমন কোনো অতিকায় অণু (macromolecule) যেমন প্রোটিন, বা ভাইরাস, বা ব্যাকটেরিয়া আদিমতম জীব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। বেশ, কিন্তু কিভাবে? এই তত্ত্ব তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে বললেন অধিযন্ত্রবাদী বা mechanistic অর্থাৎ অতিসরলীকৃত ও পরিস্থিতি বা শর্তাদির বিবেচনা ছাড়া প্রস্তাবিত এক তত্ত্ব।

ইতিমধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি প্রাণের উদ্ভব সন্ধানের

ইতিহাসের আধুনিকতম ধারাটির কাছে। আধুনিক তত্ত্বটি তৈরি হয়েছে একটু একটু করে বহুদিন ধরে। গোড়ার কথার আগেরও গোড়ার কথা আছে। 1828 সালে বিজ্ঞানী উয়োলার (Wohler) যখন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) থেকে ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$] তৈরি করলেন তখন বিজ্ঞানীদের ধারণায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এল—অজৈব বস্তু থেকে তাহলে জৈব বস্তু পাওয়া সম্ভব।

প্রায় এক শ' বছর পরে 1922 সালে রুশ বিজ্ঞানী A. T. Oparin-ই প্রথম পৃথিবীর আদিম পরিবেশে অজৈব বস্তু থেকে জৈব বস্তু উদ্ভবের একটা মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্য রূপরেখা (model) বা তত্ত্ব খাড়া করলেন। আধুনিক যুগে এই তত্ত্ব অনেকখানি চেহারা বদলেছে। কিন্তু ওপারিনের তত্ত্বই হল বস্তুবাদী বা অজীবজনি বা রাসায়নিক পরিবর্তনের আধুনিক মতবাদ (Materialistic abiogenetic or Chemical evolution)।

এই তত্ত্বটি বুঝতে হলে জানতে হবে পৃথিবীর আদিম পরিবেশ কিরকম ছিল। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার। প্রায় 4·5-5 মিলিয়ন (450—500 কোটি) বছর আগে মহাজাগতিক ধুলো ও গ্যাস ঘনীভূত হয়ে সৌরজগতের উদ্ভব হয়েছিল। যার শেষ পর্বে এল পৃথিবী। তখন কোথায় আমি, তুমি, গাছপালা। জীবজন্তু, প্রকৃতির ঋতুরঙ্গ! পৃথিবীপৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হওয়ার পর আদিম পরিবেশে H, N, CO_2, H_2O, H_2S, NH_3 CH_4 প্রভৃতি গ্যাস আর Si, Fe, Al প্রভৃতির Oxides ছিল ভূ-পৃষ্ঠে। মুক্ত O_2 ছিল না। সে পরিবেশে যদি কোনো উন্নততর জীব অন্যগ্রহ থেকে ধূমকেতু চড়িয়ে উল্কাপিণ্ডের ঢিলে বেঁধে আমাদের এমনকি নিম্নতম প্রাণীকেও পৃথিবীতে পৌঁছে দিত—সে কি বাঁচতে পারত! ভাগ্যস্ জগতসংসার গোছগাছ হয়ে যাওয়ার পর আমরা এসেছি। এইরকম অবস্থাতেও ছোট ছোট যৌগ তৈরি হতে পারত। $H+H=H_2$, $H+O\rightarrow H_2O$, $H+N\rightarrow NH_3$, $H+C\rightarrow CH_4$, $NH_3+CO_2\rightarrow HCN$। এমন কি, $NH_3+H_2O \xrightarrow[\text{Photolysis}]{\text{আলোকবিশ্লেষণ}} NO, NO_2, HNO_3$ বা hydroxylamine। এর থেকে উচ্চস্তরের যৌগ গঠন সম্ভব নয়। কিরকম যৌগ গঠন সম্ভব তা তাপগতিবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী ঠিকভাবেই করা যায়। আদিম গ্যাসগুলি বেশ সুস্থিত (stable) ছিল, তাই আরো জটিল যৌগ তখন সরাসরি তৈরি হতে পারে নি।

কিন্তু আদিম পরিবেশে প্রবল শক্তির উৎসও ছিল। তড়িৎ-নিক্ষেপ (electric discharge), তেজস্ক্রিয় রশ্মি,

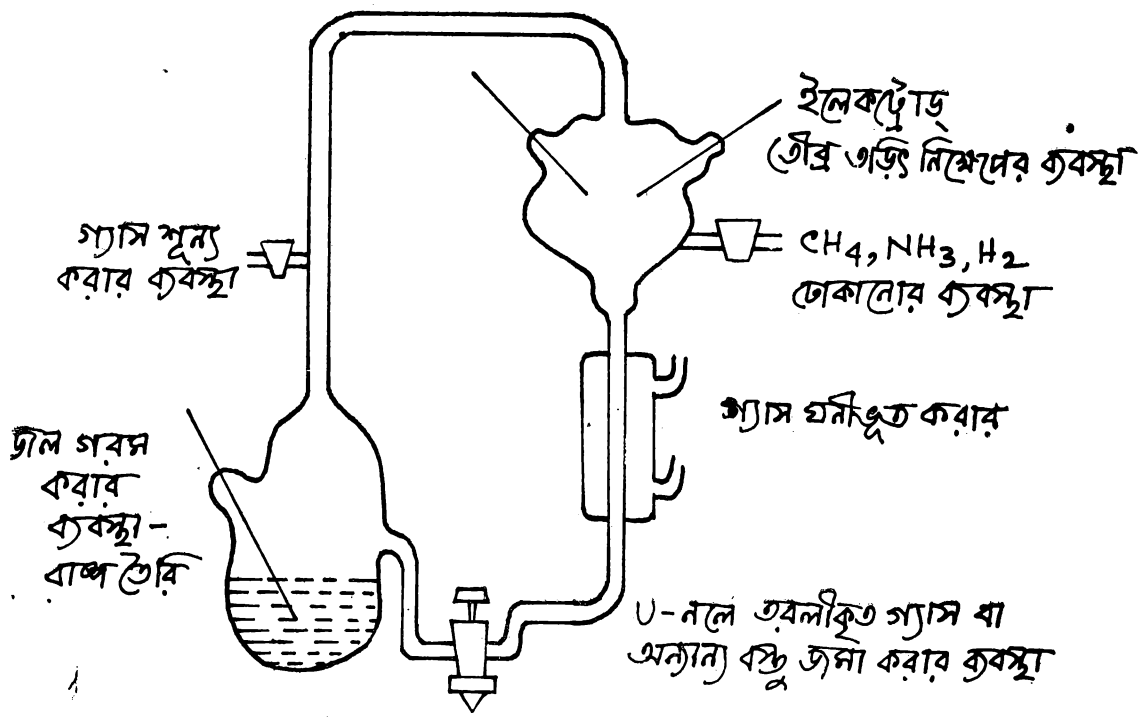

চিত্র 2 · মিলারের Spark Discharge যন্ত্র

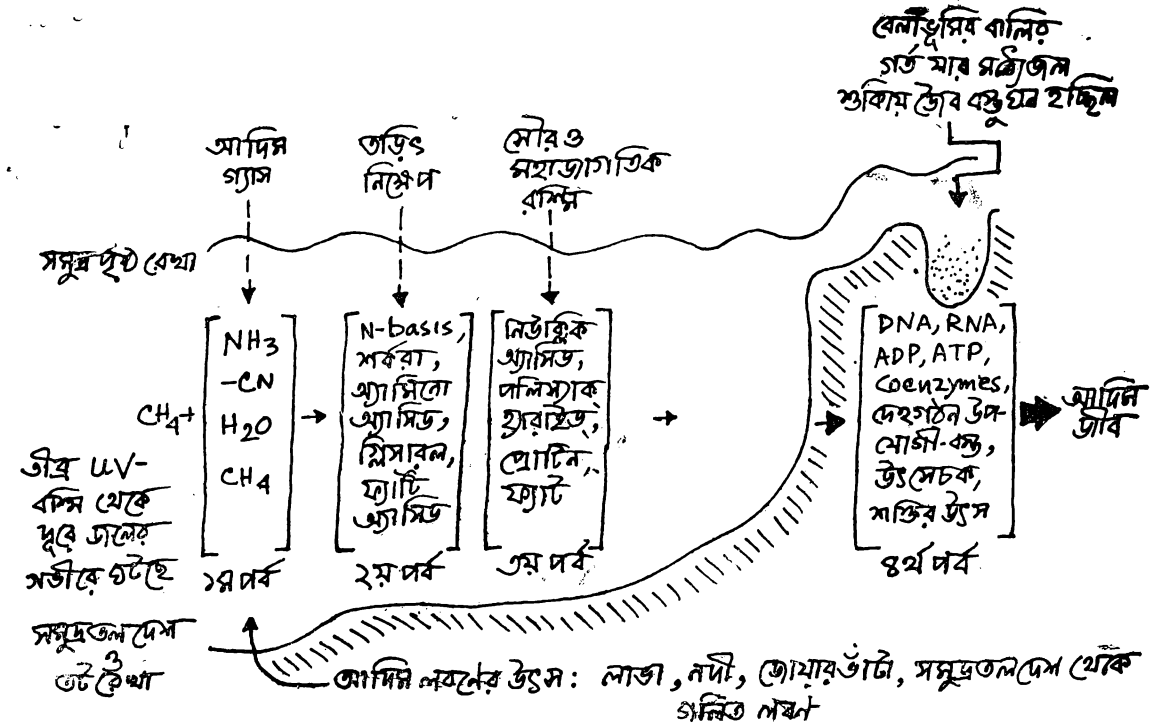

আদিম লবণের উৎস ঃ লাভা, নদী, জোয়ারভাঁটা, সমুদ্রতলদেশ থেকে গলিত লবণ

চিত্র নং 3 ঃ রাসায়নিক বিবর্তনের পর্ব। তীব্র শক্তির প্রভাবে আদিম গ্যাস থেকে ধাপে ধাপে জটিল থেকে জটিলতর যৌগ গঠিত হয়েছে। D N A, R N A, coenzymes গঠন সম্পর্কিত প্রমাণ এখনও যথেষ্ট নয়।

মহাজাগতিক রশ্মি ও উচ্চতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ এবং অতিশব্দতরঙ্গ ছিল তীব্র শক্তির উৎস। আদিম পরিবেশে সাধারণ অবস্থায় যে মৌলিক পদার্থ ও নিচুস্তরের যৌগ ছিল সেগুলির সুস্থিতি এইসব প্রবল শক্তির বিক্ষেপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। এইরকম পরিস্থিতিতে কি ঘটতে পারে 1953 সালে S. L. Miller তা একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখান। যন্ত্রটি এমন কিছু নয়, কিন্তু বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেছনে থাকে মৌলিক চিন্তা আর অভিনবত্ব। তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে মিলার দেখালেন যে, আদিম গ্যাস থেকে অনেক রকম অ্যামিনো অ্যাসিড, ইউরিয়া, কিছু জৈব অম্ল, অ্যালডিহাইড্, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্ ইত্যাদি তৈরি হতে পারে (চিত্র নং 2)। পরে অনুরূপভাবে নিউক্লিক অ্যাসিডের base, ATP, ADP, কিছু পেপাটাইড্, উৎসেচকসহ কিছু প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড্, পলিস্যাক্-হ্যারাইড্ ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব বলে দেখানো হয়েছে।

আদিমতম জীবের জীবাশ্ম হয়ত কোনদিনও পাওয়া যাবে না। প্রাচীনতম জীব যারা পৃথিবীর বুকে টিঁকে আছে তারা ব্যাকটেরিয়া। এদের মধ্যে Kakabekia umbellata হয়ত 1900 মিলিয়ন বছর আগে উদ্ভূত হয়েছিল। তিন বিলিয়ন বছর আগের ব্যাকটেরিয়ার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে বলে 1984 সালেও দাবী জানানো হয়েছে, 4·5 মিলিয়ন বছর আগের বুড়ি পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু হয়েছে রাসায়নিক বিবর্তনের পালা। 2·5—3·5 বিলিয়ন বছর আগে বারবার জীবসৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসের পর একদিন সত্যি সত্যি জীব সৃষ্টি হয়েছিল (eubiogenesis)। সালোকসংশ্লেষ যতদিন পৃথিবী-পৃষ্ঠে দেখা যায়নি ততদিন বাতাসে ছিল বিজারণ (reducing) পরিবেশ। প্রথম ইউক্যারিয়াটিক কোষ এসেছে 1·5—2 বিলিয়ন বছর আগে। তখন থেকে বিবর্তনের ইতিহাস লেখা আছে জীবাশ্মের বুকে—যতই অসম্পূর্ণ হোক।

2—2·5 বিলিয়ন বছর আগের ইতিহাস—সেই high drama-র কুশীলবরা বিনা দর্শকের করতালিতে নিঃশব্দে তাদের অভিনয় করে গেছে। এই বিপুল সৃষ্টি কোথা থেকে এল ঋক বেদের ঋষি বিস্তারিত চোখে জিজ্ঞেস করে গেছেন—'কোজন্ধা বেদ'—কে জানে এর উত্তর। আমরাও তাই বলি—কে জানে।

Institute of Agriculture, শ্রীনিকেতন
বীরভূম 731234

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

পজিশন ঠিক আছে?

হুঁ। হাত দুটো দৃঢ় এবং দেহ সংলগ্ন রেখে হাতের ওপর ভর দিয়ে বডিটাকে নীচের দিকে নামাও।

এবার হাত সোজা করে কোমর থেকে ভেঙে দেহটাকে ঠেলে উপরের দিকে তোল—

আউচ্!

গদাম্

ওয়াফস্!

এটা কি হলো, উডবুক!

তাই তো, এটা কি হলো?

ঠিক!

ছাগলের মতো অমন হুমড়ি খেয়ে না পড়লে কি দেখা যাচ্ছিল না— ইডিয়েট?

তুইই বা কেন না দেখে অমন শুয়োরের মতো গোঁত্তা মারলি, রাসকেল?

মাথাটা ফুলে আলু হয়ে গেছে!

হবেই তো, আমার থুতনিটাও আস্তো রাখিস নি!

সরি! এই নে চানাচুর খা।

আমারও সরি। ব্যায়ামের পর তো লোকে ভিজনো ছোলা বাদাম খায়। চানাচুর!

ব্যায়াম করলে চানাচুর খাওয়া বারন, কে বললে? তাছাড়া আমি কি সত্যিই ব্যায়াম করছিলুম নাকি?

না রে, আমি ওসব খাবো না।

কেন?

অম্বল হয়েছে।
এ তো ভাল জিনিস! খাবারের পর অম্বল মানে চাটনি বেশ হজমী।
চাটনি নয়—অম্বল, হয়েছে আমার পেটে বোকারাম!
তাই বল! নাঃ, এটা খুবই খারাপ। এ ক্ষেত্রে শুকনো মুড়ি খেলে কিছু উপকার পেতে পারিস।
কেন—দুটো মিশিয়ে, সঙ্গে কাঁচা লংকা আর তেল। কেমন হয়?
আজকাল অনেকেরই অম্বল হচ্ছে।
এর কারণ, মাল ঠিক মত হজম হচ্ছে না।
তাড়াতাড়ি, ইরেগিউল্যার এবং লোভে পড়ে বেশী খাওয়া এবং মানসিক চাপ ইত্যাদির জন্য এটা হয়ে থাকে।
যদি চাস তো, এতে বেশ কয়েকটা যোগ ব্যায়াম দেওয়া আছে। করে উপকার পেতে পারিস।
অম্বল সারাতে যোগ ব্যায়া
হ্যাঁ—ধনুরাসন।
এতে ইঁট চিটের দরকার নেই তো?
কিচ্ছু না। ফ্রি হ্যাণ্ড। দরকার, কনসেনট্রেশন—মনঃসংযোগ। আমি পড়ে যাচ্ছি, তুই সেই মত করে যা।
এতে যদি কোন উপকার হয় তো, আমার কোন আপত্তি নেই।
বটেই তো, তাহলে তুমি চানাচুর সাঁটাতে পারবে যে।

এটা প্রাচীন কালের মুনি ঋষিদের দান। তাঁরা সর্বদা ঈশ্বরারাধনায় মগ্ন থাকতেন, সেই সঙ্গে শরীর সুস্থ রাখতে এই যোগাসন করতেন। সুস্থ শরীর ছাড়া কোন কাজই সম্ভব নয়।

প্রাচীন কালের বাতেলা ছেড়ে এখন কি করতে হবে বল।

প্রথমে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়—

এবার পা দুটো ভাঁজ কর। দু'হাত দিয়ে গোড়ালি দুটো শক্ত করে ধর। বুক ও হাঁটু যতটা সম্ভব ওপরে তোল। পেটটা শুধু মাটিতে লেগে থাকবে। একেবারে ধনুক।

ওপস্!

সাব্বাস! এইভাবে তিরিশ সেকেণ্ড থাক। এতে শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে অম্বল দূর হয়। আমি গুণছি— এক-দুই-তিন-চার—

হুঃ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—

—নয়, দশ, এগারো, বারো—

এগাই যাঃ!

তিরিশ সেকেণ্ড না হতেই ওর অম্বল ভাল হয়ে গেল?

দমাস্

উপস্!

একি করলি! এর মধ্যেই হাল ছেড়ে দিলি? তাছাড়া হাত-পা আস্তে ধীরে ছাড়তে হয়। লেগেছে?

ইয়াও! দাঁড়া- তোকে আমি ধনুক বানাবো!

ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-!!

উফ্! খুদেকে কতবার বলেছি, পরের ব্যাপারে বেশী নাক গলিও না। এখন বোঝ ঠ্যালা!

ইংরেজ দুঃসাহসী

ইংরেজ এই অ্যাডভেঞ্চারারের নাম অ্যানড্রু ব্যাটেল। ষোড়শ শতাব্দীতে বহু বছর কাটিয়েছেন আফ্রিকায়। দেশে ফিরে এসে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছিলেন বন্ধুবর স্যামুয়েল পারচাসকে। বই আকারে কাহিনী-গুলো প্রকাশিত হয় 1625 সালে। দারুন কাটতি হয়েছিল বইখানার (নাম : পারচাস হিজ পিলগ্রিমস্)।

দু ধরনের দানবের কথা বলেছিলেন ব্যাটেল। সব চাইতে পেল্লায় দানবটার নাম পোঙ্গো, ছোটটার নাম এনগেকো। পোঙ্গোকে দেখতে মানুষের মত—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই রকম—কিন্তু সবই দানবিক আকারের। বেজায় লম্বা, চোখ কোটরে বসা, ভুরুতে লম্বা লম্বা চুল। মুখ, কান আর হাতে একদম লোম নেই। কিন্তু বপুটা বেশ লোমশ। পাটকিলে রঙের পাতলা লোমে ঢাকা সর্বাঙ্গ। তারা পিটিয়ে নিগ্রো মারে, হাতি মারে কাঠের গদা দিয়ে ঠেঙিয়ে। দশ-জন মানুষও একজন পোঙ্গোকে ধরে রাখতে পারে না—এত শক্তিশালী।

শয়তানের পদচিহ্ন

ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে 1855 সালে রাতারাতি এই পদচিহ্ন আবির্ভূত হয় এবং আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেয় গ্রাম-বাসীদের। 8 ফেব্রুয়ারী ভোরবেলা হঠাৎ দেখা গেল ডেভন গ্রামের আঠারোটা পরিবারের বাড়ি ঘিরে বরফের ওপর আঁকা রয়েছে অসংখ্য পদচিহ্ন। মানুষের পায়ের ছাপ নয়। আকারে ছোট সাইজের ঘোড়ার খুরের ছাপের মত। দাগগুলো পড়েছে একেবারে সোজা রেখায়—একটা ছাপের ঠিক পেছনে পড়েছে আর একটা ছাপ। পদচিহ্নের মালিকের ঠ্যাং যেন একখানা। অথবা, অদ্ভুতভাবে ঠ্যাং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে হাঁটতে অভ্যস্ত।

এক রাতেই অজ্ঞাত এই জীবটি 100 মাইল পেরিয়ে গেছে। পথে একটা নদী পড়েছিল—অনায়াসে তা পেরিয়েছে। বাড়ি ঘরদোরের চারদিকে চক্কর মেরেছে। কোথাও কোথাও সটান পাঁচিল আর ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে—আবার কোথাও দেওয়াল আর ছাদ ফুঁড়ে চলে গেছে।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা কয়েক রাত বাড়ির বাইরে বেরোয়নি—তারা ধরেই নিয়েছিল শয়তান টহল দিতে এসেছে গ্রামে!

ব্রেজিলের উভচর

পোকার মত একটা বিশাল দানবকে দেখা গেছে ব্রেজিলের নানা জায়গায় 1860 সালে। ঠিক যেন একটা কেঁচো! কিন্তু তিন ফুট মোটা—মুখটা শুওরের মুখের মত। লোকজন দেখলেই বিচিত্র প্রাণীটা সটান পাতাল প্রবেশ করে—পেছনে রেখে যায় তিন ফুট চওড়া মাটি কেটে যাওয়ার দাগ।

সিকিমে পদচিহ্ন

মেজর লরেন্স এল্টন ওয়াডেল ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীতে ডাক্তারী করে গিয়ে 1899 সালে যে বইখানা লেখেন, তা থেকে জানা যায় হিমালয়ের বরফে 17000 ফুট উচ্চতায় তিনি দেখেছেন বিরাট বিরাট পায়ের ছাপ।

শেরপা কুলিরা বলেছিল, এ-পদচিহ্ন লোমশ বুনো মানুষের। হিমালয়ের যে অঞ্চলে বরফ কখনো গলে না—সেখানে থাকে এরা। এদের সঙ্গী কিংবদন্তীর সাদা সিংহ—যাদের গর্জন শোনা যায় ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে। তিব্বতের সবাই বিশ্বাস করে এই প্রাণীদের অস্তিত্বে।

চার আঙুলে দানব

লোমশ দানবটা মাথায় আট ফুট ঢ্যাঙা—হাতে কাঠের গদা। 1902 সালে ইডাহোর চেস্টার ফিল্ডে একদল মানুষের রক্তজল করে দিয়েছিল বন্‌বন্‌ করে গদা ঘুরিয়ে। পরে তার পায়ের ছাপ মাপতে গিয়ে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছিল গ্রামবাসীদের। পায়ে আঙুল আছে মোটে চারটে। প্রতিটি পদচিহ্ন লম্বায় বাইশ ইঞ্চি এবং চওড়ায় সাত ইঞ্চি।

অস্ট্রেলিয়ায় গরিলা?

1912 সালে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-য়ে কারোকবিলি পাহাড়ে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছিলেন চার্লস হারপার নামে এক জমি জরীপকারী ভদ্রলোক। নিবাস সিডনী শহরে। রক্তজল হয়ে যাওয়ার মত অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল সেই রাতে।

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ এত মড় মড় আওয়াজ হচ্ছে কেন বুঝতে না পেরে তাঁবুর লোকজন আগুনের মধ্যে আরও কিছু কাঠ ফেলে দিয়েছিল। অগ্নি শিখা পট পট শব্দে লাফিয়ে উঠতেই সেই আলোয় দেখা গেছিল এক দানব আগন্তুককে।

অতিকায় মানবাকৃতি সেই পশু দাঁড়িয়েছিল আগুন থেকে বিশগজ দূরে। চাপা গলায় গজরাতে গজরাতে বুক

চাপড়াচ্ছিল দুই থাবা দিয়ে। এই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যায় তাঁবুর একজন লোক।

আগন্তুক দাঁড়িয়েছিল সিধে হয়ে। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট আট কি দশ ইঞ্চি। শরীর, হাত আর পা ঢাকা লালচে রংয়ের লম্বা চুলে। শরীরে ঝাঁকুনি দিলেই কেঁপে কেঁপে উঠছিল লোমরাশি। আগুনের আভায় মনে হয়েছিল কাঁধ আর পিঠ কুচকুচে কালো রঙের; দীর্ঘ লোমে ছেয়ে রয়েছে। সবচেয়ে অবাক হতে হয়েছে তার মানবিক আকার দেখে। মানুষের মত হয়েও যেন পুরোপুরি মানুষ নয়।

বপুর কাঠামো বিশাল। যেন অসাধারণ দৈহিক শক্তি আর সহ্যশক্তির আধার। বাহু বিলক্ষণ লম্বা এবং পেশী-বহুল। মাথা আর মুখ ক্ষুদে—কিন্তু মানবিক। চোখ বড়, কালো, অন্তর্ভেদী এবং কোটরে বসা। ভয়াবহ মুখ বিবরে রয়েছে দুটো বিশাল এবং লম্বা কুকুরে দাঁত। চোয়াল বন্ধ থাকা অবস্থায় দাঁত দুটো চেপে বসেছিল নিচের ঠোঁটের ওপর।

আগুনের আভায় সম্মোহিতের মত সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই গজরাতে গজরাতে প্রথমে দুপায়ে সিধে অবস্থায়, তারপর চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দৌড়ে গেছিল অন্ধকার বনের দিকে।

মিঃ হারপার অবশ্য বলেছিলেন, বিকটাকৃতি এই জানোয়ার নিশ্চয় একটা গরিলা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তো গরিলা নেই। স্থানীয় লোকজন এক ধরনের দু-পেয়ে লোমশ পশু অথবা বুনো মানুষকে yowie নামে ডাকে। সে রাতে কি এই জীবটাই এসেছিল ভয় দেখাতে?

ইয়েতি : হিমালয়ের আতঙ্ক

1921 সালের প্রথম এভারেস্ট অভিযানে গেছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সি কে হাওয়ার্ড-বারি। মাথার ওপর অনেক উঁচুতে তুষার ছাওয়া অঞ্চলে দেখেছিলেন বেশ কিছু কালো ছায়া মূর্তির নড়াচড়া। 22 সেপ্টেম্বর সেখানে পৌঁছেছিলেন। তাদের দেখতে পাননি। কিন্তু পেয়েছিলেন অতিকায় পদচিহ্ন। বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় এ কাদের পায়ের ছাপ?

চিন্তায় পড়েছিলেন ভদ্রলোক। পদচিহ্নের মাপও নিয়েছিলেন। মানুষের পায়ের ছাপের তিনগুণ বড়।

শেরপা কুলিরা বলেছিল, এ পদচিহ্ন তাদেরই যারা আধা মানুষ এবং সিধে হয়ে হাঁটে। তাদের নাম স্থানীয় ভাষায় metoh অথবা mehteh kangmi; একজন সংবাদদাতা তুষার মানবের নাম দেন Abominable Snowman।

গা-শিউরোনো তুষার-মানব কাহিনী নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে মাতামাতি শুরু হয় এরপর থেকেই।

শেরপারা হিমালয়ের আতঙ্কদের দৈহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিল, তাদের গা নাকি কালো লোমে ঢাকা—মুখটা কিন্তু সাদা এবং অনেকটা মানুষের মুখের মত। হাত খুব লম্বা—হাঁটুতে ঠেকে। গায়ে অসম্ভব জোর। টেনে শেকড় সমেত গাছ উপড়ে ফেলতে পারে। চমরী গাই গাই আর বরফের পোকামাকড় তাদের খাদ্য। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষিদে পেলে উপত্যকায় নেমে এসে মানুষ ধরেও খায়।

সাসকোয়াচ : আমেরিকার আতঙ্ক

মাউণ্ট সেণ্ট হেলেন পাহাড়টা আছে ওয়াশিংটন স্টেটে। পাহাড়ের পুবদিকে কিছু খনি-শ্রমিক ভীষণ ভয় পেয়েছিল যা দেখে, সেই কাহিনীই এবার বলা যাক।

ঘটনাটা ঘটে 1924 সালে। কেবিনের বাইরে বিশাল পদচিহ্ন দেখে মাথা ঘুরে যায় দুই খনি-শ্রমিকের। যার পায়ের ছাপ, তাকেও দেখা গেল একদিন। গাছের আড়াল থেকে প্যাট প্যাট করে চেয়েছিল ওদের দিকে। দেখতে তাকে নর-বানরের মত। গুলি চালায় একজন খনি-শ্রমিক। খুব সম্ভব মাথায় চোট লাগে প্রাণীটার। চম্পট দেয় আহত অবস্থাতেই।

তারপরেই আবার দেখা যায় আর একটা প্রাণীকে। দাঁড়িয়ে আছে খাদের দেওয়ালের পাশে। গুলি বর্ষণ চলে তার ওপরেও। পিঠে গুলিবিদ্ধ উধাও হয়ে যায় আজব জীব।

সেই রাতেই কেবিনে হানা দেয় ওই রকমই অন্য দুটো জীব। দেওয়াল আর ছাদ ভেঙে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে। বিরাট পাথর ঠুকে কাঠের কেবিন ভাঙবার চেষ্টা করেছিল রাতের হানাদাররা। কিন্তু পারে নি। গুলির আওয়াজেও ভয় পায় নি।

পাঁচ ঘণ্টা পরে ভোরের আলো ফুটতেই ব্যর্থ মনোরথ হানাদাররা বিদায় নেয়। খনি-শ্রমিকরা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিল বিশাল বিশাল পদচিহ্ন।

এরাই পরে বিগফুট বা সাসকোয়াচ নামে আতঙ্ক সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডায়।

1951 সালে এভারেস্টের গিরিসঙ্কটে এরিক শিপটণের তোলা বিশাল পদচিহ্ন। পাশে একটি বরফ কুঠার।

ভিন্নগ্রহী আতঙ্ক

1970 নাগাদ আর এক ধরনের সিধে-হয়ে হাঁটা দানব-কাহিনী শুরু হয় পৃথিবী জুড়ে। এদের আবির্ভাব নাকি উড়ন চাকি থেকে—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় UFO অথবা Unidentified Flying Objects।

রজার্স ফ্যামিলির কাহিনীই বলা যাক। এঁরা থাকতেন ইণ্ডিয়ানার রোচডেল অঞ্চলে। 1972 সালের অগাস্ট মাসে উড়ন চাকি থেকে এসে অদ্ভুত প্রাণী দেখা দিয়ে গেল এঁদের।

ঘটনার শুরু একটা আলোকময় বস্তু দেখবার পর থেকে। খুব কাছের শস্য ক্ষেত্রের ওপর আকাশে দেখা গেল চলমান আলোকপিণ্ড। দেখলেন ফ্যামিলির একজন। কিন্তু তারপরেই সেই রাতেই ফ্যামিলির প্রত্যেকের কানে ভেসে এল অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দলহরী।

কিসের এত আওয়াজ দেখবার জন্যে একজন বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখতে পেল বিশালকায় গায়ে গতরে বেশ ভারি একটা উদ্ভট দর্শন জীব ভুট্টার ডাঁটিগুলো দুহাতে ফাঁক করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর একবার মিসেস রজার্স একেই দেখলেন জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে অবিকল মানুষের মত। কিন্তু তাড়া খেয়েই পালিয়ে গেল চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে।

কোন বারেই তাকে খুঁটিয়ে দেখা যায় নি। কেন না, প্রতিবারেই তার আবির্ভাব ঘটেছে রাত্রে। তবে হ্যাঁ, তার গায়ে কালো চুল আছে বিস্তর। গায়ের গন্ধটা অতিশয় বদ—ঠিক যেন পচা জানোয়ার বা আঁস্তাকুড় থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আশ্চর্য এই প্রাণীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তার দেহে কোন রকম বস্তু আছে বলে মনেই হয়নি।

তার পায়ের ছাপ একবারও পাওয়া যায়নি। এমন কি যখন কাদা মাড়িয়ে পালিয়েছে—তখনও পদচিহ্ন এঁকে যায় নি কাদার ওপর। লাফিয়েছে ঝাঁপিয়েছে দৌড়েছে—কিন্তু যে ভাবেই হোক না স্পর্শ করে নি কিছু। নলখাড়ার বন বা ঝোপঝাড় ঠেলে যখন চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে তখন কোন শব্দ ভেসে আসেনি। তার চাইতেও তাজ্জব ব্যাপার হল তার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে যেন তার ভেতর দিয়ে পেছনের সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

তা সত্ত্বেও আশ্চর্য এই দানব যে একেবারেই অবস্তু, তাও নয়। রজার্স ফ্যামিলি ছাড়াও বেশ কিছু চাষীও দেখেছে ডজন ডজন মুরগীর ঘাড় মুচড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু খায়নি—খাদ্যে রুচি নেই যেন আগন্তুকের। শুধু মুরগী নয়, কাঁচ ভেঙেছে, বেড়া ভেঙেছে, শুওরের জন্যে রেখে দেওয়া বালতি থেকে টম্যাটো আর শশা উধাও করে দিয়েছে।

একদিন রাতে মুরগী-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল নিশুতি রাতের এই উৎপাতকে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল সে। দরজার মাপ চওড়ায় ছ'ফুট, লম্বায় আট ফুট। মুরগী-ঘরের ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছিল না তার জন্যে। দরজার মাথায় ঠেকেছিল তার কাঁধ—গলা বলে কিছু নেই, তার মুখ বা চোখ দেখা যায়নি। শুধু বোঝা গেছিল লম্বা লম্বা বাদামী বা মরচে রঙের চুল রয়েছে সারা গায়ে। মনে হয়েছিল, ঠিক যেন একটা ওরাংওটাং বা গরিলা দাঁড়িয়ে আছে পিঠ ফিরিয়ে আর একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মত আওয়াজ করে যাচ্ছে।

অজানা বিভীষিকার ওপর সঙ্গে সঙ্গে গুলি বর্ষণ করেছিল রজার্স ফ্যামিলি। গুলি লেগেও ছিল—এত কাছ থেকে বুলেট ফসকায় না। কিন্তু সে যে জখম হয়েছে, সে রকম কোন লক্ষণ দেখায় নি।

ককেসাসের ক্যাপটার দানব

স্পাই সন্দেহ করে কিভাবে কিম্ভূতকিমাকার এক দানবিক প্রাণীর দেখা পেয়েছিল রাশিয়ার একজন আর্মি ডাক্তার, এইবারে আসা যাক সেই কাহিনীতে।

ডাক্তারের নাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভি এস ক্যারাপেটিয়ান। 1941 সালের শেষের তিন মাস শ্বশাসিত সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক যখন ডাগেস্টান-য়ে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে, তখনকার ঘটনা।

খবর এল খুব কাছেই পাহাড়ী অঞ্চলে অদ্ভুত চেহারার একটা লোক লুকিয়ে আছে। নিশ্চয় ছদ্মবেশী গুপ্তচর। ডাক্তার গেলে নিশ্চয় ধরে ফেলবেন সত্যিই সে ছদ্মবেশ পরে আছে কিনা।

কর্নেল ফিরে এসে পেশ করলেন চাঞ্চল্যকর এক রিপোর্ট ঃ "এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি প্রাণীটাকে। দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে। পুরুষ নগ্ন খালি পা। মানুষ নিঃসন্দেহে, কেননা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষের মত। তবে বুক, পিঠ আর কাঁধ ঢাকা পড়েছে ঝোপের মত রাশি রাশি চুলে। চুলের রঙ গাঢ় বাদামী…"

"দুহাত সটান ঝুলিয়ে রেখে বুক চিতিয়ে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রইল সে। বেশ ঢ্যাঙা—প্রায় ছ'ফুট। বিশাল বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিমাটা ঠিক দৈত্যের মত। হাতের আঙুল মোটা, শক্তিতে ঠাসা এবং রীতিমত লম্বা। সব মিলিয়ে স্থানীয় লোকদের চেয়ে সে অতিকায়।

"তার চোখ দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। এ চোখে কোন ভাষা নেই, অর্থ নেই—শূন্যগর্ভ অসার চাহনি। জান্তব চাহনি বলতে যা বোঝায়…."

"উষ্ণ ঘরে তাকে যখন রাখা হয়েছিল ; প্রচণ্ড ঘামছিল। মুখের কাছে জল আর খাবার তুলে ধরা হয়েছিল—খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল—কোন স্পৃহা সে দেখায় নি। আমার সিদ্ধান্ত এই ঃ ছদ্মবেশী সে নয়—নিশ্চয় এক ধরনের বন্য মানব।"

ডাক্তারবাবু তখন যদি জানতেন, ককেসাস অঞ্চলে বহু পরিচিত এই ধরনের প্রাণীকেই বলা হয় 'ক্যাপটার'—বিলক্ষণ বিস্মিত হতেন নিঃসন্দেহে।

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর আত্মীয়স্বজন

'অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান' নামটা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তোলবার পর একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছিল। সিধে হয়ে হাঁটে এমন লোমশ তুষার-মানব শুধু এক জায়গাতেই নেই—পৃথিবীর নানান জায়গায় রয়েছে। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। থাকে শুধু বন্য এবং মানুষের অগম্য অঞ্চলে।

যতদূর খবর পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় তিব্বত হিমালয় অঞ্চলে হয়ত তিন ধরনের ইয়েতি আছে ঃ ছোট, বড় এবং খুব বড়। হয়ত এদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে—অথবা একেবারেই নেই।

বড় ইয়েতিদের সঙ্গেই কেবল বিগফুট, সাসকোয়াচ, স্কাঙ্ক এপ (যুক্তরাষ্ট্রের এভারগ্লেড অঞ্চলে দেখা গেছে), মিসৌরীর (যুক্তরাষ্ট্র) মস্টার 'মোমো' এবং অন্যান্য আমেরিকান দানব-প্রজাতিদের আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে। চৈনিক নরদানবদের সঙ্গে বড় ইয়েতিদের অনেকটা মিল দেখা গেলেও রাশিয়ান 'ক্যাপটার' একেবারেই আলাদা জাতের।

ভূগোলকের নানান অঞ্চলে যাদের নিবাস, তাদের পরস্পরের মধ্যে শুধু প্রচুর লোম আর সিধে-হয়ে-হাঁটা ছাড়া আর কোন মিল নেই? সুবিখ্যাত সাসকোয়াচ শিকারী জন গ্রীন এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, তা শোনা যাক ঃ

'মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, নর্থ আমেরিকার স্থল-দানবরা অন্যান্য স্থল-দানবদের চেয়ে ঢের বেশি বড়; রাশিয়ার স্থল-দানবরা হিমালয়ের ইয়েতিদের চেয়ে অনেক ঢ্যাঙা, কিন্তু গায়ে গতরে তেমন ভারী নয়; হিমালয়ের ইয়েতিদের দৈহিক বর্ণনা শুনে আর পায়ের ছাপ দেখে মনে হয়, এরা মানুষের মত নয় মোটেই, অর্থাৎ, অমানবিক। রাশিয়ার স্থল-দানবরা সেদিক দিয়ে খুবই মানবিক।'

বিগফুট খতম করলে কি নরহত্যার অপরাধ হয়? গ্রীন বলেছেন—'সাসকোয়াচরা মানুষের কাছাকাছি কোন বিরল প্রাণী, এ কথা বলা সঙ্গত নয়। সংখ্যায় তারা অগণ্য। মানুষও নয়। কিন্তু নৃশংসও নয়। বরং নরম ধাতের। দানব যারা কখনও দেখেনি, তারাই এই বিরল প্রাণীটাকে অযথা ভয়ঙ্কর দানব ভেবে নিয়েছে।'

হিমালয়ের ইয়েতিদের ক্ষেত্রেও বাস্তব থেকে সরে গিয়ে রঙ চড়িয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অযথা তাদের রোমাঞ্চকর চাঞ্চল্যকর করে তোলা হয়েছে।

শেরপাদের কাছে ইয়েতি কোন রহস্যই নয়। ইয়েতিরা দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে, এ খবর তারা মনে রেখেছে কমপক্ষে দু-শ বছর ধরে। হিমালয়ের গ্রামে যারা থাকে অথবা শিকার করা যাদের পেশা বা নেশা—তারা ইয়েতির নাম শুনে আঁৎকে ওঠে না—বিরল হিমালয়-উদ্ভিদ সম্পর্কে যতটুকু ঔৎসুক্য, ততটুকুই ঔৎসুক্য ইয়েতি সম্পর্কে। ইয়েতিরা মানুষ দেখলেই গা-ঢাকা দেয় কেন? কারণ একটাই—মানুষের যাতায়াতের পথে তো তাদের নিবাস নয়।

হিমালয়ের শিকারীরা বলেন, ইয়েতিরা মানুষ নয়, তুষার-অঞ্চলেও তারা থাকে না। এদের আস্তানা হিমালয়ের সব চাইতে উঁচু অরণ্যে—প্রায় অগম্য গভীর সেই জঙ্গলে ঢোকা দুঃসাধ্য বললেই চলে। ঘন বনে তারা কখনো নাকি চার হাত-পায়ে হাঁটে, কখনো গাছ থেকে গাছে দোল খেয়ে যায়। তুষার-অঞ্চলে যখন আসে, গরিলাদের হাঁটার মত সিধে হয়ে দুলে দুলে হাঁটে। এই অবস্থাতেই অনেক অভিযাত্রী তাদের দেখেছে। তুষার-অঞ্চলে টহল দিতে কেন আসে ইয়েতিরা? শেরপাদের মতে, তারা আসে নোনতা শ্যাওলার সন্ধানে; হিমবাহ যে সব মাটি পাথর নুড়ি বয়ে এনে হিমবাহর প্রান্তদেশে জমিয়ে রাখে, নোনতা শ্যাওলা থাকে সেই সবের খাঁজে। আইভান স্যানডারসন অবশ্য বলেন, ইয়েতিরা আসে 'লিচেন' নামক শৈবালের খোঁজে—এই শৈবালের খাদ্যমূল অনেক বেশি।

এশিয়ার স্থল-দানবদের চেয়ে সামান্য বেশি পেটুক আর কৌতূহলী আমেরিকার স্থল-দানবরা। তবে দুই মহাদেশেই এরা নিরালা নিবাস পছন্দ করে খুবই। অবিশ্বাসীরা কিন্তু বলেন, অতিশয় এই প্রাণীরা এত অনায়াসে সন্ধানী মানুষের চোখে ধুলো দেবে—এও কি সম্ভব?

এর জবাব দিয়েছেন ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা পিটার বায়ারনে। তিনি বলেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাসকোয়াচ এলাকার ক্ষেত্রফল 1,25,000 বর্গ মাইল। বিশাল এই এলাকার বেশির ভাগই গভীর জঙ্গলে ভরা পাহাড় পর্বত। রাস্তাঘাট আছে খুব কম। মানুষের লোকালয় আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাইরের দর্শনার্থী কস্মিন কালেও কখনো আসে না।

সাসকোয়াচ আর অন্যান্য লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে থাকার মত জায়গার অভাব নেই এই অঞ্চলে।

তা না হয় হল। কিন্তু এদের সনাক্তকরণের প্রশ্নটা যে অমীমাংসিতই থেকে গেল। আকারে যারা বেজায় বড়, লোমশ আর সিধে হয়ে হাঁটে, তারা না হয় স্রেফ নিরাপত্তা আর নির্জন নিবাসের তাগিদে দুর্ভেদ্য অরণ্য অঞ্চলকেই উত্তম বলে মনে করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য দেখেই তাদের সনাক্ত করা যায়। কিছু জিউগ্লোডন আর প্লেসিওসর যদি ইতিহাসের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে—দু-পেয়ে কিছু প্রহেলিকাও অতীত রহস্যের নিদর্শন স্বরূপ ভূগোলকে থাকবে না কেন? [শেষাংশ 39 পৃষ্ঠায়]

যে জাহাজ চলে জলের তলায়

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর তিন ভাগ জুড়ে জল আর এক ভাগ মাত্র স্থল। আর তাই এই বিশাল জলরাশিকে ঘিরে মানুষের মনে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। আজও নেই। মানুষ অবাক হয়ে দেখত সমুদ্রের গভীরে কেমন বিচিত্র সব প্রাণী ভেসে বেড়াচ্ছে, অদ্ভুতভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। আর কল্পনায় মানুষ ডুব দিত সাগরের গভীর তলদেশে রূপকথার মৎস্য-কন্যার মত।

অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে সামুদ্রিক প্রাণীর মত ভেসে থাকার বা ডুব দেওয়ার স্বপ্ন মানুষের সফল হয়েছে ডুবো-জাহাজের মাধ্যমে। এর জন্যে তাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। ডুবো জাহাজ বা সাবমেরিনের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে অনেক বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সবার আগে পাই ম্যাসিডোনিয়ার সেই বিখ্যাত রাজা আলেকজান্দার দি গ্রেটকে। কিংবদন্তী আছে সেই কবে মহামতি আলেকজান্দার নাকি সাবমেরিনের আদিরূপ কাঁচের তৈরি পিপেয় চড়ে সমুদ্রের বুকে গিয়ে বিরাট বিরাট সব সামুদ্রিক প্রাণীর দর্শনলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

ডুবো জাহাজের সূচনা যদি এমন নিরীহভাবে হয়েও থাকে আসলে কিন্তু এর সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধের প্রয়োজনেই। ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক কর্নেলিস ড্রেবেল (1572-1634) যখন তাঁর ডুবো জাহাজ (যা আসলে কিনা দাঁড়ে টানা ডুবো নৌকা) আবিষ্কার করেন তখন থেকেই কিন্তু তাঁর মাথায় যুদ্ধের ব্যাপারটা ঘোরাফেরা করছিল। এই সাবমেরিনের মহড়া চলেছিল টেমস্ নদীর তীরে ওয়েস্ট-মিনিস্টার আর গ্রীনিচের মধ্যে 1620 সালে। আর এই ঘটনাটা বেশ হৈচৈ ফেলেছিল সে সময় ইংলণ্ডে। 1625 সালে লেখা বেন জনসনের নাটকে এর বিশদ উল্লেখ আছে। অবশ্য এটাকে ঠিক সাবমেরিন বললে ভুলই হবে।

তারপর দেড়শো বছর কেটে গেল সত্যিকারের সাব্-মেরিন আবিষ্কার হতে। ডেভিড বুশনেল 1775 সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বৃটিশ অবরোধ ভাঙবার জন্যে এই ডুবো জাহাজটি তৈরি করেন। ডেভিড বুশনেলকেই ডুবো জাহাজের জনক বলা যেতে পারে। তিনি দেখালেন জলের তলায় বারুদের বিস্ফোরণ সম্ভব। আর তাঁর ঐ জাহাজে থাকত কাঠের টর্পেডো বা ম্যাগাজিন যা সাবমেরিনের ভেতর থেকে শত্রু জাহাজের ওপর নিক্ষেপ করা যেত। আকারে এটি ছিল একটা কাঠের লাট্টুর মত। জাহাজটিতে অবশ্য একজন যাত্রীই থাকতে পারত আর এর আকার এমন ছিল যে যাতে এটা সহজে জলে ভাসতে পারত।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সাবমেরিন বিজ্ঞানের কোন্ সূত্র মেনে চলে। আর্কিমিডিসের সূত্র প্রমাণ করার জন্যে ডেকার্তে আবিষ্কার করেছিলেন কার্টেজিয়ান ডাইভার আর কার্টে-জিয়ান ডাইভারের সূত্র মেনে চলে সাবমেরিন। সাবমেরিনে

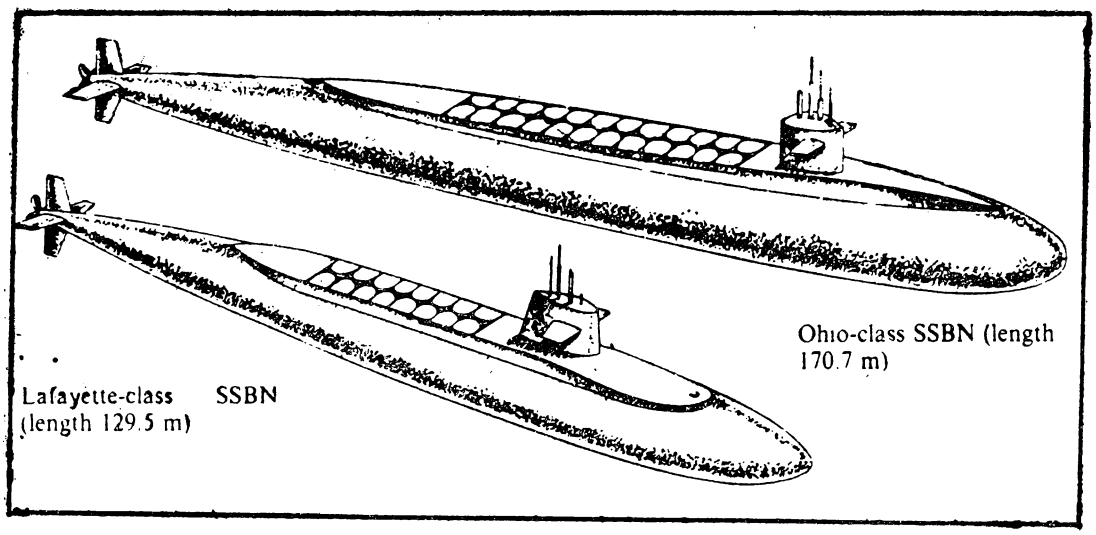

থাকে বড় বড় ভারী ট্যাংক আর এদের সঙ্গে থাকে ভালভ যার সাহায্যে ট্যাংকে জল ঢোকান যায়। যখন ডোববার দরকার হয় তখন পরিমাণ মত জল ট্যাংকগুলোতে ঢোকান হয় যাতে জাহাজের ওজন তার অপসারিত জলের ওজনের চেয়ে বেশি হয় আর তাহলেই সে ডুবতে পারে। আর ভাসবার প্রয়োজন হলে কম্প্রেসড্ এয়ারের সাহায্যে চালিত শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে জল বের করে দেওয়া হয় যাতে জাহাজটি তার অপসারিত জলের চেয়ে ওজনে হালকা হয়ে যায় আর পরিণামে জাহাজটি ভেসে ওঠে। ডুবো জাহাজে থাকে হাল আর থাকে পেরিস্কোপ যার সাহায্যে জলের ওপরকার বস্তুর দর্শনলাভ সম্ভব হয়।

ডেভিড বুশনেলের জাহাজে পায়ে চালান একটা ভালভের সাহায্যে এর ভেতরে জল ঢুকিয়ে একে ডোবান যেত আর ভাসাবার দরকার হলে দুটো পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করা হত। বুশনেলের কাজে কোন ত্রুটি ছিল না। তাঁর জাহাজে ছিল দুটি প্রোপেলার যার একটি থাকত লম্বালম্বি অপরটি ছিল সমান্তরালে—যেগুলোকে চালক তার প্রয়োজনমত ঘোরাতে পারত। ঐ জাহাজে আরও ছিল গভীরতা মাপবার যন্ত্র আর উজ্জ্বল কম্পাস। আধ ঘণ্টার মত কাজ চলতে পারে এমন বাতাসও থাকত সেই জাহাজে।

বুশনেলের সাবমেরিনকে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলত বুশনেলের কচ্ছপ। এটাকে নিয়ে পরীক্ষাও নেহাৎ কম হয়নি। 1776 সালে সার্জেন্ট এসরা লী এই ডুবো জাহাজটি নিয়ে গিয়েছিলেন নিউইয়র্ক বন্দরে। কিন্তু বারুদের ম্যাগাজিনটি ঠিকমত লাগাতে পারেন নি অন্য জাহাজের সঙ্গে। বুশনেলের পথে আরও একটু এগোলেন আর একজন আমেরিকান রবার্ট ফুলটার (1765-1815)। ফরাসী বিপ্লব শেষ হবার আগে থেকেই ফরাসীদের সংগে কাজ করেছিলেন এই শিল্পী ও আবিষ্কারক। নেপোলিয়নের অর্থানুকূল্যে ফুলটন 1801 সালে দেখালেন তাঁর নটিলাস নামের ডুবো জাহাজটি টর্পেডো বহন করতে পারে এবং তার দ্বারা জাহাজ ধ্বংস করাও সম্ভব। ফ্রান্সের নৌবিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের পছন্দ হল না ফুলটনের জাহাজটি আর ব্রিটিশ সরকারও এটি যখন বাতিল করে দিলেন তখন অগত্যা ফুলটন এলেন স্বদেশে আমেরিকায়।

ফুলটনের নটিলাস কিন্তু মানুষের কল্পনাকে উস্কে দিয়েছিল। কল্পবিজ্ঞানের বিশ্ববিখ্যাত লেখক জুল ভের্ন 1870 সালে লিখে ফেললেন তাঁর সেই জগদ্বিখ্যাত কাহিনী টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী। কল্প-কাহিনীর সেই সাবমেরিনটির নাম দিলেন নটিলাস আর নায়কের নাম ক্যাপ্টেন নেমো। জুল ভের্ন কল্পনায় এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন! তাঁর সাবমেরিনটি চালান হত বিদ্যুতের সাহায্যে। কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী যে শুধুই অলস কল্পনা নয় তারই প্রমাণ এই উপন্যাসটি। কেননা 1881 সালে অর্থাৎ বইটি প্রকাশের প্রায় 11 বছর পরে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ভের্নের এই তত্ত্বটি কাজে লাগিয়েছিলেন সাবমেরিন তৈরির সময়। নাম তাঁর ক্লদ্ গোবেৎ। তিনি বিদ্যুৎচালিত সাবমেরিন তৈরি করেছিলেন।

সত্যি বলতে কি আজকের দিনের সাবমেরিন বুশনেলের সেদিনের সাবমেরিনের উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। গোবেৎ ব্যবহার করেছিলেন ব্যাটারি। জে. পি. হল্যান্ড 1896 সালে ব্যবহার করেছিলেন গ্যাসোলিন, 1903 সালে ফ্রান্স ব্যবহার করেছিল ডিজেল ইঞ্জিন। পারমাণবিক শক্তিকে এখন সাবমেরিন চালানর কাজে লাগাচ্ছে আমেরিকা। পারমাণবিক শক্তিচালিত এই সাবমেরিনটিরও নাম নটিলাস। রাশিয়াও পারমাণবিক শক্তিচালিত একটি সাবমেরিন ব্যবহার করছে—যেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করেছিল কিছুদিন আগে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাবমেরিনের কার্যকারিতা হাতেকলমে প্রমাণিত হল নিদারুণভাবে। জার্মান নৌ-বাহিনী 372টি ইউ-বোটের সাহায্যে মিত্রশক্তির বিপুল পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী 1018টি ইউ-বোট নিয়েও কম ক্ষতি করে নি বিরোধী পক্ষের। আর আমেরিকা সাবমেরিনের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান নৌ-বাহিনীকে করেছিল বিধ্বস্ত।

এত কথার পরেও কিন্তু সাবমেরিন প্রসঙ্গ শেষ হয়নি। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন সাবমেরিনের সৃষ্টি শুধু ধ্বংসের প্রয়োজনেই—আমাদের কিন্তু সাবমেরিনের প্রসঙ্গ উঠলেই মনে পড়ে যায় বরেণ্য এক দেশপ্রেমিকের কথা। ব্রিটিশের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার দুর্জয় বাসনায় তিনি 1941 সালের 17ই জানুয়ারী গোপনে দেশত্যাগ করেন। জার্মানীতে গিয়ে নাৎসীনায়ক হিটলারের দৃষ্টি-ভঙ্গী তাঁর ভাল লাগে নি। তখন জার্মানী থেকে জাপানে যাবার পরিকল্পনা করেন তিনি। ব্রিটিশের চোখকে ফাঁকি দিতে তাঁকে সাহায্য নিতে হয়েছিল সাবমেরিনের। 1943 সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে ইউ একশো নব্বই নম্বরের জার্মান সাবমেরিনটি তাঁকে আর আবিদ হাসানকে নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিল দঃ পূঃ এশিয়ার পথে—সেটা মাদাগাস্কারের প্রায় 400 মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এসে থেমেছিল 28শে এপ্রিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল জাপ রাজকীয় নৌবহরের আই 29 সাবমেরিনটি। সহযোগী আবিদ হাসানকে নিয়ে সেই সাবমেরিনে চড়ে 6ই মে সুমাত্রার উত্তরে অবস্থিত সবং দ্বীপে এসে নেমেছিলেন মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সাবমেরিনের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কি আমরা কোনদিন ভুলতে পারব?

2।।2 নিউটন অ্যাভেনিউ, দুর্গাপুর-5

তিন

শেষ পর্যন্ত কি করে যে আমি আর সুজনকাকা খিদিরপুরের বাইশ নম্বর ডক থেকে এম ভি আন্দামান জাহাজে উঠতে পারলাম, সেকথা পুরোপুরি লিখতে হলে এক বিরাট মহাভারত হয়ে যাবে।

জাহাজে রিজার্ভেশন পাওয়া এক বিরাট ঝামেলা। কাকার এক বন্ধু শংকর দাশগুপ্ত আন্দামানে ফরেস্ট অফিসার। তাকে ট্রাংক-কল করে কোনমতে দু'টো কেবিন সিট পাওয়া গেল। তার আগে নিতে হলো বসন্তের টিকে আর কলেরার ইনজেকশন—সে বড় ঝক্কিকারী ব্যাপার। তারপর আছে নিজেদের জিনিসপত্র গোজগাছ করা, সেও তো বিরাট সমস্যা। কিন্তু সুজনকাকা খুবই বিচক্ষণ আর দূরদর্শী মানুষ। তাই অধিকাংশ জিনিসপত্রই আগে জোগাড় করে রেখেছিলেন। হাতুড়ি, দড়ি, ম্যাপ, দূরবীন থেকে শুরু করে পেনসিল কাটবার ছুরি পর্যন্ত গুছিয়ে আনতে হয়েছে। আমি নিজেও অবশ্য আর একটা জিনিস সঙ্গে নিয়েছি, কাকাকে এখনো বলি নি। বেশ কতগুলো দোদমা আর চকলেট বোমা। গত পুজোর সময় কিনেছিলাম কিন্তু সেগুলো আর ফাটানো হয় নি। আমার ড্রয়ারের এককোণে পড়ে ছিল। ভাবলাম, অত দূরে অভিযানে যাচ্ছি, বলা যায় না, কখন কোন কাজে লাগে। দুটো রঙিন চশমাও নিয়েছি আমাদের জন্য।

আন্দামানে যাবার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাবা। বাবা তো এক কথার মানুষ, বাবার কথার নড়চড় আমরা কোনদিন দেখি নি। কিন্তু এবার যে কাকা কোন মন্ত্রে বাবাকে বশ করে আমার জলপাইগুড়ি যাওয়া নাকচ করলেন, তা আজও জানতে পারি নি। বাবা শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিন্তু বাদলের স্কুল তো খুলে যাবে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে না?'

সুজনকাকা শান্তগলায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'সে দায়িত্ব আমার দাদা।'

এরপর বাবা আর অমত করেন নি। বাবাকে অবশ্য আন্দামানে অভিযানের সবকিছু খুলে বলা হয় নি। শুধু বলা হয়েছে, কাকার এক বন্ধু আন্দামানে ফরেস্ট অফিসার, তারই ওখানে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা।

জাহাজ ঘাটায় বাবা মা ও পাপিয়া বিদায় জানাতে এসেছিল। বিকেল পাঁচটায় জাহাজ ছাড়বার কথা, কিন্তু ছটার আগে জাহাজ নড়ল না জাহাজঘাটা থেকে। শেষ পর্যন্ত একসময় জাহাজ চলতে শুরু করল, সামনের ফোল্ডিং ব্রিজটা দু'ভাঁজ হয়ে ওপরে উঠে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল বাবা মা ও পাপিয়ার রুমাল নাড়া। আচমকা মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। বাবা মা'র একমাত্র ছেলে আমি, কলকাতা থেকে এতদূরে কখনো যাই নি। এখন বাবা মা ও পাপিয়াকে ঘিরে সমস্ত স্মৃতিগুলো বর্ষার মেঘের মতো ভিড় করে আসছে আমার মনে। আমার ভেজা চোখের সামনে কলকাতার ছবি ঝাপসা। পকেট থেকে রুমালটা বের করতেই দেখি, আমার পাশে ডেকের রেলিং ধরে সুজনকাকা দাঁড়িয়ে।

'বাদল, চল, খেতে যাবি চল। খাবার ঘণ্টা বাজছে—'

'সে কি, এখনো সন্ধে হয় নি ভালো করে। এখনই রাতের ডিনার?'

'জাহাজে তাই দস্তুর। এখানে সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই রাত্রের খাওয়া শেষ।'

বাইরে তাকিয়ে দেখি, বাইশ নম্বর ডক ছেড়ে জাহাজ অনেকটা এগিয়ে শেষ লক গেটে অপেক্ষা করছে। এখান থেকে জাহাজঘাটার বিদায়ী আত্মীয় পরিজন বন্ধুদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

জাহাজের ডাইনিং হলটা দারুণ। পার্ক স্ট্রিটের কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে আগে একবার বাবা মা'র সঙ্গে খেয়েছিলাম। অনেকটা ঐরকম ছিমছাম সুন্দর। সাজানো টেবিলের ওপর ছাপানো মেনুকার্ড। খাবার আয়োজনও ইলাহী। নানরুটি, মাটন রোস্ট, ফিস রোল, চাটনি, ফল ও আরো অনেক কিছু যার নামই আমি জানি না।

এবার টেবিলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো আমাদের। সামান্য বেঁটে, চোখেমুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। আমাদের উলটোদিকে বসে খাচ্ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো, একে কোথায় যেন দেখেছি, কিন্তু কোথায় তা' ঠিক মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোক কাকার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'আপনাকে বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। আন্দামানে এই প্রথম বোধহয় ?'

কোন কথা না বলে কাকা শুধু মাথা হেলিয়ে মুচকি হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল কাকার উপদেশ।

'সবসময় মনে রাখবি বাদল, আমরা নতুন জায়গায় গোপন কাজে যাচ্ছি। নতুন কোন লোকের সঙ্গে যতটা সম্ভব কম কথাবার্তা বলবি। মনে থাকবে তো ?'

সেই বেঁটেমতন ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'আমি বিমানেশ তলাপাত্র। আন্দামানে আমার ব্যবসা, কলকাতা থেকে হরদম যাতায়াত করতে হয়। বুঝলেন কিনা, প্লেনেই যাতায়াত করি, তবে এবার কিছুতেই প্লেনের টিকিট পেলাম না। তাই জাহাজেই যেতে হচ্ছে—'

কাকা একমনে নিস্পৃহভঙ্গীতে খেয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রলোকের কথার উত্তরে একবার শুধু বললেন, 'বিমানেশবাবু বিমানের টিকিট পেলেন না। আশ্চর্য !'

'তা' যা বলেছেন !' একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে কথাটা বলে বিমানেশবাবু আমার দিকে তাকালেন, 'আরে খোকা তুমিও বুঝি কাকার সঙ্গে আন্দামানে বেড়াতে যাচ্ছ ? তা' যাও। খুব ভালো জায়গা, এমন সুন্দর দৃশ্য ভূ-ভারতে আর কোথাও তুমি পাবে না।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি তো অবাক। এই ভদ্রলোক কী করে বুঝলেন যে আমি ভাইপো। পরক্ষণেই অবশ্য মনে পড়ল, এই তো কিছুক্ষণ আগে ডাইনিং হলে আসবার পথে একবার কাকা বলে ডেকেছিলাম। ভদ্রলোক বোধহয় তখনই শুনতে পেয়েছেন। আশ্চর্য ? ভদ্রলোক দেখছি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছেন আমাদের। কী মতলব কে জানে !

তাই মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে নির্বিকার ভাবে বললাম, 'আপনি বুঝি ওখানে প্রায়ই যান ?'

'যাই মানে, ওখানেই তো থাকি। আসলে ওখানেও আমার একটা বাড়ি আছে, কলকাতায়ও আছে। কখনো কলকাতা, কখনো পোর্ট ব্লেয়ার, এইভাবেই কাজ চালাতে হচ্ছে।'

ভদ্রলোকের কথার উত্তরে আর কী বলব বা বলা যায় ভেবে পেলাম না। তাই চুপচাপ খেতে লাগলাম। বিমানেশবাবুও চুপ করে গেলেন।

বাবার কাছে গল্প শুনেছিলাম, স্টিমারের রান্না নাকি দারুণ হয়। এখানে দেখছি, জাহাজের রান্নাও খুব ভালো। মাটন রোস্টটা খেতে এত দুর্দান্ত যে তা' দিয়ে দু'খানা নান রুটি সাবাড় করলাম। আর ফিস রোলটাও জম্পেশ। একটা খেয়েই পেটভর্তি। শেষ আইটেম একটা আপেল। না খেয়ে আপেলটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এলাম। পরে খাওয়া যাবে। এখন আর পেটে জায়গা নেই।

ডাইনিং হল থেকে বেরোতেই ডেক-বারান্দা। অনেকগুলো লম্বা চেয়ার সাজানো। বেশ কিছু লোক তাতে বসে বাইরের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। বাইরে তাকাতেই দেখি, আমাদের জাহাজ গঙ্গার বুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, একদম নড়ছে না। জাহাজ থেকে চোখে পড়ে, দূরে কলকাতা শহরের আলোকমালা। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে সৃজনকাকা সরু কাঠি দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি বের করতে ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা কাকা জাহাজটা চলছে না কেন ? ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

সৃজনকাকা হেসে জবাব দিলেন, 'নারে, ইঞ্জিন খারাপ হবে কেন ! আসলে, গঙ্গায় জোয়ার এলে জাহাজ আবার চলবে। তা' প্রায় রাত দু'টো হবে।'

একটু দুঃখিত গলায় বললাম, 'তাহলে জাহাজটা এখন না ছাড়লেই পারত। আরো বেশ কিছুক্ষণ কলকাতায় থাকা যেত।'

দু'হাত দিয়ে কাকা আমায় জড়িয়ে ধরলেন, 'বাদল, বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ লাগছে, তাই না !'

গলাটা একটু যেন ধরে এলো, বললাম, 'না এমন কিছু না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কাকা বললেন, 'চল, কেবিনে যাবি নাকি ? জিনিসপত্রগুলো একটু গোজগাছ করা দরকার।'

জাহাজের কেবিনগুলো খুবই ভালো। আমাদের আট নম্বর কেবিনে চারজনের স্লিপার আছে। তা'ছাড়া প্রত্যেকের জন্য ওয়ারড্রোব, বেসিন সোফা। জাহাজে সবকিছুর বন্দোবস্ত এত নিখুঁত যে কারো কোন অসুবিধে হয় না।

আমাদের কেবিনে রয়েছে দুজন মারোয়াড়ী স্বামী-স্ত্রী। মহিলাটি প্রায় পর্দানশীন। খুবই নিরীহ ধরনের মানুষ। সৃজনকাকা এমন সহযাত্রী পেয়ে বেশ খুশি।

'বুঝলি বাদল, ভালোই হলো। আমরা দুজনে বসে নিশ্চিন্তে আলোচনা করতে পারব। বিশেষ অসুবিধে হবে না। বিমানেশ তলাপাত্রের মতো কেউ থাকলে আর দেখতে হতো না।'

আমিও ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক। লোকটা হয়তো খারাপ নয়, কিন্তু বড্ড বকবক করে। এরকম লোক আমার একদম পছন্দ নয়। কেমন ছ্যাবলা মনে হয়।

কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের নিশ্চিন্তে বসে থাকতে হলো

না। সুটকেশ খুলে জিনিসপত্র সবে ঠিকঠাক করে রেখেছি, কাকা বিছানা দু'টো পাতছেন, এমন সময় দেখি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিমানেশ তলাপাত্র। মুখে সেই বিগলিত হাসি।

'আরে মিঃ বোস, আপনি এখানে! আপনাকে তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যাক, আমার ভাগ্য ভালো। আপনাকে সহযাত্রী হিসেবে কাছাকাছি পেয়েছি। আমি সাত নম্বর কেবিনে।'

বুঝতে পারছিলাম, সৃজনকাকা বেশ বিরক্ত হচ্ছেন, তবু ভদ্রভাবে বললেন, 'ভালোই হলো। অবসর সময়ে আপনার সঙ্গে গল্প করে কাটানো যাবে।'

কথা বলতে বলতে মেঝেতে ছড়ানো জিনিসের দিকে নজর পড়ল বিমানেশ তলাপাত্রের।

'আ'রে আপনি দেখছি অনেককিছু এনেছেন। বাইনোকুলার, হাতুড়ি, ফিতে—আর এটা কি কমপাস?'

'হ্যাঁ, এক ধরনের কমপাস। এটা হলো ব্রানটন কমপাস। কিন্তু আপনি এতসব জানলেন কী করে?'

'আরে মিঃ বোস, আমি বিজনেসম্যান। আমাদের সবকিছুই অল্পবিস্তর জানতে হয়। না হলে কি আর ব্যবসা চলে!'

'তা' ঠিক, তবু আপনাকে দেখে আপনার কথা শুনে অবাক হচ্ছি।'

'না না, এ কী বলছেন আপনি। আপনারা ইয়ং ম্যান। অনেককিছু জানেন শোনেন। তুলনায় আমরা তো প্রায় অর্বাচীন। এই কোন রকমে কাজকর্ম চালিয়ে নিই।'

চুরুটের বাক্স খুলে কাকা একটা চুরুট অফার করলেন মিঃ তলাপাত্রকে। মুড দেখে বুঝলাম, তলাপাত্রের ওপর কাকার বিরূপ মনোভাব অনেকটা কমেছে। মিঃ তলাপাত্রকে মোটামুটি বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন। তবু সাবধানের মার নেই।

মিঃ তলাপাত্র চুরুটে টান দিয়ে বললেন, 'বাঃ বেশ চুরুট তো! কোত্থেকে আনান? ত্রিচিনোপল্লী থেকে নাকি? আজকাল তো আর হাভানা থেকে চুরুট আসে না।

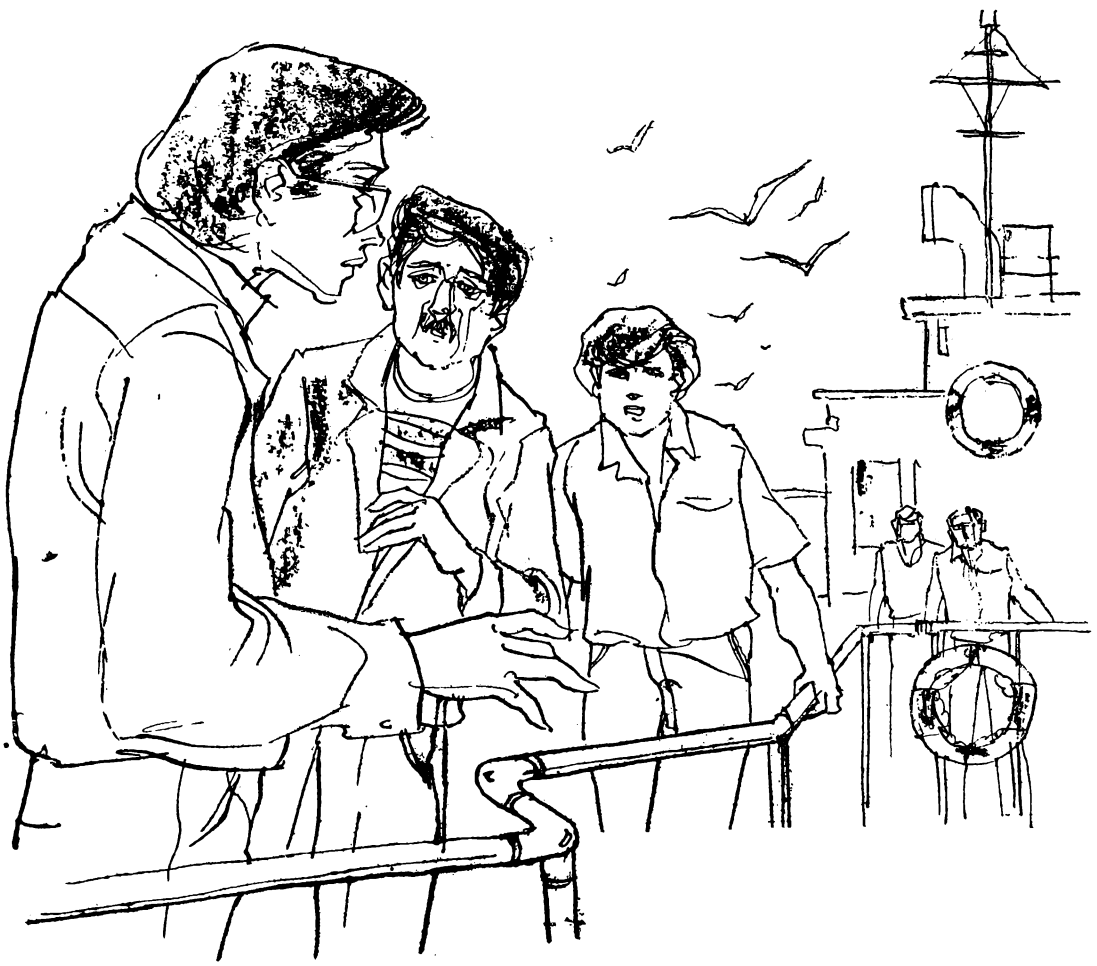

ক্যাস্ত্রোর জমানায় ভালো চুরুট খাওয়ার মেজাজটা বিলকুল বরবাদ। কী বলেন?'

ক্যাস্ত্রো নামটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে। অথচ ভদ্রলোক যে কে, তা' ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ল না। তবে রাত্রিতে ঘুমোতে যাবার আগে মনে পড়ল, ফিদেল ক্যাস্ত্রো কিউবার প্রেসিডেণ্ট।

মিঃ তলাপাত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে আপনারা বোধহয় অ্যাডভেনচারের খোঁজে আন্দামান যাচ্ছেন। কি সেই অ্যাডভেনচার, কোথায় কেন, তা' অবশ্য বুঝতে পারছি না। তবু আপনাকে একটা হক কথা বলি, আন্দামান খুব নীরস জায়গা। না আছে কোন বড়সড় জন্তু জানোয়ার, না কোন হিমালয়ের মতো উঁচু পাহাড়। আছে খালি মশা।'

কাকার মুখ দেখে বুঝলাম, মিঃ তলাপাত্রের কথায় কাকা বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন, তবু হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে মশাদের ওপর আপনি বেশ রেগে আছেন।'

'আরে মশাই রাগব না মানে। এই মশার কামড়ে তিন তিনবার ম্যালেরিয়ায় ভুগলাম। শুধু ম্যালেরিয়া নয়, আরো বহু ঝামেলা আছে আন্দামানে। জারোয়া! জারোয়াদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। একেবারে মূর্তিমান বিভীষিকা, মানুষ দেখতে পেলে আর কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে বিষমাখানো তীর, আর তক্ষুনি মৃত্যু। তারপর মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে ওরা। বুঝলেন?'

কাকার মুখে গভীর চিন্তার ছায়া, 'ওদের কথা বইতে পড়েছি বটে। কিন্তু ওরা যে এতটা বিপজ্জনক, সেটা তো জানতাম না।'

'বিপজ্জনক নয় শুধু, মূর্তিমান শয়তান। আমিই তো একবার ওদের কবলে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। তবে সে গল্প আজ নয়, পরে আর একদিন হবে।'

'তাই ভালো—' কাকা সুটকেশের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে শুরু করলেন। মিঃ তলাপাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা মিঃ বোস, আপনি তো বললেন না, সত্যি সত্যিই আন্দামানে কেন যাচ্ছেন?

মিঃ তলাপাত্রের দৃষ্টি এই মুহূর্তে অন্তর্ভেদী, যেন এই একটা প্রশ্নেই আমাদের সমস্ত গোপন কথাই জেনে নিতে চান। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কাকা হালকা গলায় বললেন, 'এমন কিছু নয়। আন্দামান দেখবার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই ছিল। তাই বেড়াতে যাচ্ছি। আর তাছাড়া ওখানকার পাথর টাথরের ব্যাপারে আমার খানিকটা পেশাগতভাবে আগ্রহ আছে। তাই ওটাও হবে কিছুটা। রথ দেখা ও কলা বেচা দুইই একসঙ্গে। কি বলেন?

'আচ্ছা, আজ তবে চলি, কাল সকালে আবার দেখা হবে। গুড নাইট।' মিঃ তলাপাত্র হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন। যাবার সময় আমার হাতে একটা ক্যাডবেরির চকলেটও গুঁজে দিলেন।

মিঃ তলাপাত্র চলে গেলে কাকা আমার দিকে তাকালেন, 'বাদল, লোকটা কীরকম অদ্ভুত। সন্দেহজনকও বটে, তাই না।'

ক্যাডবেরির চকলেটটা সুটকেশে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে উত্তর দিলাম, 'কেন, ভদ্রলোককে আমার তো বেশ ভালোই লাগল। দেখলে না, উনি কীরকম চকলেট দিয়ে গেলেন।

'সেইজন্যই তো মনে হলো বেশি করে। যাই হোক, আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

কাকার এই মতের সঙ্গে আমি কিছুতেই ঠিক সায় দিতে পারছিলাম না। তবুও চুপ করে রইলাম।

[চলবে]

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

কারিগরি ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রথম পাঠ

নিজে নিজে কর

১ম ও ২য় খণ্ড এখন দুটি খণ্ডেই পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি খণ্ড ১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

ট্যাপা-মাছ / ধীরেন দত্ত

কিছুদিন আগের ঘটনা, সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। হাওড়া জেলার বালীর এক ভদ্রলোক সকালে বাজারে গিয়ে আগেই মাছের বাজারে ঢোকেন। নানা রকম মাছের দর শুনে ভদ্রলোকের ভিরমি লাগার অবস্থা। কাটা-পোনা 40/45 টাকার, ফেঁসা টেসা হেজি পেজি মাছের দর 15/16 টাকার কম নয়। এদিকে পকেটতো প্রায় গড়ের মাঠ।

এক ব্যাপারির ঝুড়িতে দেখলেন তরতাজা কয়েকটা ভেড়ীর মাছ, দর কত? 8 টাকা করে কিলো, কানকো ফাঁক করে দেখলেন মাছগুলো তখনও তাজা আছে। সবকটা মাছই ওজন করিয়ে থলেয় পুরে, খুশিমনে ভদ্রলোক বাড়ির দিকে হাঁটলেন। বাড়ি গিয়ে গিন্নিকে সর্ষেবাটা ধনেপাতা সহযোগে রান্না করতে বললেন। পরিবারের আটজনের ভাগে দু-তিন টুকরো করে পড়লো।

খাওয়া দাওয়া সেরে ভদ্রলোক বিছানায় বিশ্রাম নিতে গেলেন ঘণ্টাখানেক বাদে দারুণ গা-গুলনী আর সেই সঙ্গে বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ হল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার ছেলেরা ভদ্রলোককে রিক্সায় চাপিয়ে উত্তর-পাড়ার হাসপাতালে পাঠালেন, একটু পরে পরিবারের সকলকেই হাসপাতালে পাঠাতে হোল। বেলা একটা নাগাদ ভদ্রলোকের মৃত্যু সংবাদ এল, তার পর এক এক করে অন্য সাতজনই মারা গেলেন রাত আটটার মধ্যে।

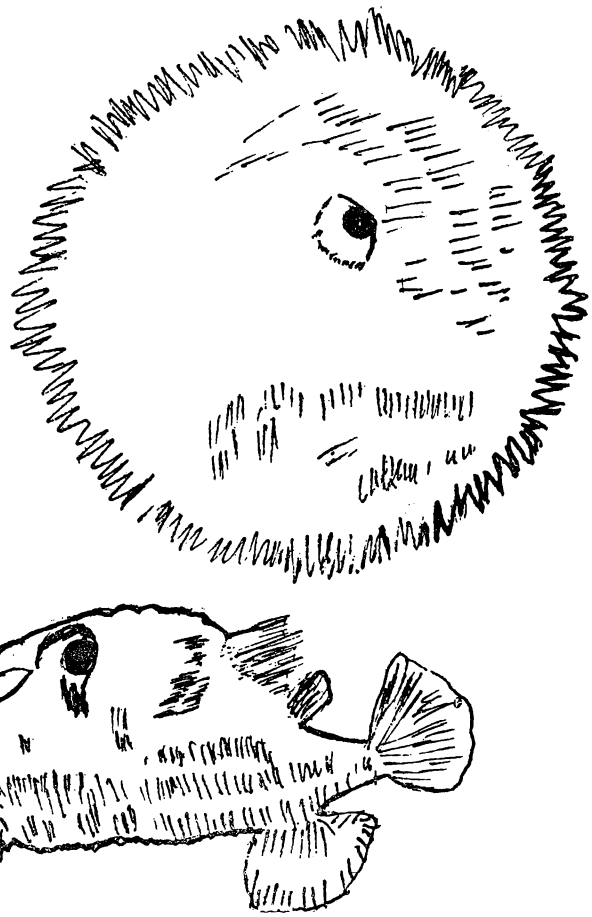

আসলে ট্যাপা মাছটা কি! ইংরাজিতে এই মাছের নাম পাফারফিশ (Pufferfish)। এই মাছের চামড়ার নিচে লিভারে প্রজনন যন্ত্রে বিষ লুকিয়ে আছে। নিচে সাধারণ মাছের ছবি দেওয়া হল। জালে বা বঁড়শিতে ধরা পড়লে, একটু দলাই মালাই করলে ফুলে গোল বলের আকার ধারণ করে গায়ে কাঁটা বের হয়ে একটা কাঁটার বলে পরিনত হয়। একটা আট ইঞ্চি লম্বা মাছ শরীরের মধ্যে এক লিটার জল ঢুকিয়ে নিতে পারে। উষ্ণ এলাকার সমুদ্রতীরে বা নদীর মোহনায় এরা দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। এক একটি দলে দশ বারোটা থেকে শত শত মাছ থাকে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিকটবর্তী সমুদ্রের দ্বীপগুলোর আদিম অধিবাসীরা এদের দেহ থেকে বিষ নিষ্কাশন করে। তীরের ফলায় লাগিয়ে শত্রু বা বন্য প্রাণীর মোকাবিলা করে। জাপানে বা জাপান সমুদ্রের দ্বীপগুলোর লোকেরা এদের বলে ফুগু, এখানে একটা প্রচলিত কথা আছে, ফুগু খেতে যেমন মজাদার, মরণটাও তেমনি ভয়ঙ্কর। এই মাছের শরীর থেকে নিষ্কাশিত বিষকে ওরা বলে ম্যাকি ম্যাকি, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর মৃত্যু।

একদিন কন্দখালি থেকে নদীর ধার ধরে সন্দেশখালি ফিরছিলাম বাঁকের মাথায় দেখি জেলেডিঙি চাপান করে এক মাছ-মারা হা-করা জাল পেতে মাছ ধরছে। কাওড়া গাছের শিকড় এড়িয়ে ওর ডিঙিতে উঠে গেলাম। দেখি পাটাতনের ওপর এক চাকন মাছ ভর্তি। জিজ্ঞাসা করলাম কি মাছ ভাই? লোকটা কপালে এক চাপড় মেরে বলল, হায় কপাল, যদি ফ্যাসা মাছও পড়ত তাহলেও এক দেড়শ টাকা পেতাম, ট্যাপা মাছ যমেও ছোবে না।

সন্দেশখালি, উঃ 24-পরগনা

মজার অঙ্ক নিয়ে

নন্দলাল মাইতি

অঙ্কের বই-এ মজার অঙ্কের দেখা মেলা ভার। শিক্ষাবিদরা বলেন, স্কুলের অঙ্ক যথাসম্ভব বাস্তব জীবনভিত্তিক হওয়া দরকার। কারণ, অঙ্কের সঙ্গে বাস্তব-জীবনের যোগ খুব বেশি। অবাস্তব ধরনের অঙ্ক কষলে শিক্ষার্থীর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দেখা যায়। তাই, বর্তমানের অঙ্কের বই-এ অতি বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবন থেকে নানা সমস্যা নিয়ে বহু অঙ্কের সমাবেশ করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব জীবনভিত্তিক হোক আর কাল্পনিক যাই হোক অঙ্ক কষতে অনেকেরই ভাল লাগে না। কারুর কারুর মাত্র ভাল লাগে। একথা যে কেবল একালেই প্রযোজ্য তা নয়, সেকালেও প্রযোজ্য। গণিতজ্ঞরা সাধারণত জটিল সমস্যার উদ্ভাবন ও সমাধানে আনন্দ পান। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁদের নজর কম। কিন্তু তা বলে তাঁরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি একেবারে নজর দেননি, এমন বলা যায় না। তাঁদের লেখায় কখনো কখনো কল্পনার রঙে রঞ্জিত ও দৈনন্দিন ঘটনা থেকে নেওয়া সমস্যা নিয়ে অঙ্ক দেখা যায়।

তোমরা বোধ হয় জান, গণিতের ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসন। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা তাঁদের লেখায় কিছু কিছু মজার ও চিত্তাকর্ষক অঙ্কের উদাহরণ দিয়েছেন। এ-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্ত, প্রথম ভাস্কর ও দ্বিতীয় ভাস্করের আর্যভটীয় গ্রন্থের টীকা থেকে একটি মজার অঙ্ক আলোচনা করব। এখানে যে-পদ্ধতিটি দেখাব, তাও তাঁরই অনুসরণে। তবে আরো সহজে অঙ্কটি কষা যায়। তার ভার তোমাদের ওপর।

সমস্যা ঃ একটি বাজপাখি 12 মিটার উঁচু একটি ভগ্ন প্রাচীরের ওপর বসে আছে। প্রাচীরের তলা থেকে 24 মিটার দূরে একটি ইঁদুর বাজপাখিটিকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে প্রাণরক্ষার জন্য প্রাচীরের তলায় তার গর্তের দিকে ছুটল। কিন্তু বাজপাখি প্রাচীরের ওপর থেকে তির্যকপথে সাঁ করে নেমে ইঁদুরটিকে ধরে ফেলল। এখন যদি বাজপাখি ও ইঁদুরের গতিবেগ সমান হয়, তা হলে ইঁদুরটি কত দূরত্ব অতিক্রম দূরত্ব করেছিল? আর বাজপাখিই বা অনুভূমিক পথে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছিল?

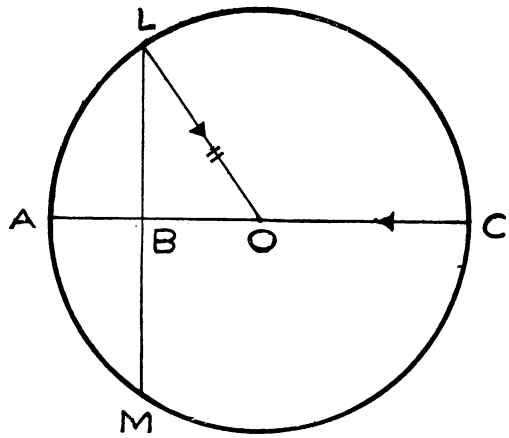

ধরা যাক, C-বিন্দুতে ইঁদুরটিকে বাজপাখি L-বিন্দু থেকে দেখতে পেল। ইঁদুরটি B-বিন্দুতে গর্তের দিকে আত্মরক্ষার জন্য ছুটল, কিন্তু বাজপাখি LO পথে উড়ে এসে O-বিন্দুতে ইঁদুরটিকে ধরে ফেলল।

এখন, O-বিন্দুকে কেন্দ্র করে OC ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হলো। ধরা যাক, ABOC অনুভূমিক ব্যাস এবং LBM উল্লম্ব জ্যা যা ব্যাসকে B-বিন্দুতে ছেদ করেছে।

কল্পনা করা যাক, LB হচ্ছে প্রাচীর এবং BC হচ্ছে ইঁদুরের যাতায়াতের পথ।

অঙ্ক বা সমস্যা থেকে আমরা পাচ্ছি,

LB = 12 মিটার ; BC = 24 মিটার ; CO = LO, কারণ ইঁদুর ও বাজপাখি উভয়ের গতিবেগ সমান।

এবার, অঙ্কটি কষতে গেলে বৃত্তের একটি ধর্ম জানা দরকার ঃ যদি বৃত্তের ব্যাস (ABC) ও জ্যা (LBM) পরস্পর সমকোণে ছেদ করে, তা হলে

$$LB^2 = AB \times BC \ldots\ldots 1$$

এখন, 1নং-এ LB ও BC-এর মান বসিয়ে পাই

$$AB = 6 \text{ মিটার}$$

অতএব, $CO = \frac{1}{2}(BC + AB) = \frac{1}{2}(24 + 6) = 15$ মিটার

$\therefore BO = BC - OC = 24 - 15 = 9$ মিটার।

সুতরাং ইঁদুর 15 মিটার ও বাজপাখি 9 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিল।

ঠাকুরানীচক, হুগলী -712613

বার্নাড হিউভেলম্যান কি বলেন এ ব্যাপারে? তাঁর মতে এশিয়ার 'বুনো মানুষ'রা 'পিথিকানথপাস' জাতির জীবিত বংশধর। প্লায়োসিন যুগের শেষদিকে এরা এশিয়ার দক্ষিণ পুব অঞ্চলে দাপিয়ে গেছে। সুপ্রাচীন নর-বানর গোষ্ঠীর মধ্যে বড় আকারের যারা ছিল, তাদের নাম পিথিকানথপাস রোবাসটাস আর মেগানথপাস প্যালিও-জাভানিকাস। প্লায়োসিন যুগের শেষের দিকে এশিয়ার দক্ষিণ পুব অঞ্চলে এরাই বেশি সংখ্যায় থেকেছে। এই প্রজাতিদের মধ্যে যারা ছিল পিগমি আকারের, তারাও নিশ্চয় টিঁকে আছে আজও। তাই ছোট আকারের অসনাক্ত নর বানর জাতীয় প্রাণীদের দেখা যায় মাঝে মাঝে।

'পিকিং মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি' সংস্থার জো গুয়োক্সিন বলেছেন, 1970 সালে হুবি প্রদেশে নর বানর জাতীয় যে জানোয়ারদের দেখা গেছিল, দানবিক আকারের সেই এপম্যান—যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার অভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে লুপ্ত হয়ে গেছে।

উপসংহার

দানবরা কি সত্যিই উড়তে পারে?

স্থলে আর জলে যারা প্রহেলিকা সৃষ্টি করে চলেছে, অন্তরীক্ষেও তারা রহস্য রচনা করছে কি?

সাক্ষ্যপ্রমান যা পাওয়া গেছে তা খুব একটা মনে দাগ কাটাবার মত নয়।

পুরাতন কাহিনীতে চিত্ত চঞ্চল করার মত কিছু কাহিনী আছে বটে। ড্রাগন (নিঃশ্বাসে যার আগুন), রকপাখি (আরব্যরজনীর সেই ভয়ঙ্কররূপ), হারপিজ (গ্রীকপুরানের ডানাওলালুঠের) এবং থাণ্ডার বার্ড (আমেরিকান ইণ্ডিয়ান উপকথা অনুসারে)।

টেরোড্যাকটিল-এর জীবাশ্ম বিচার করে জানা যায়, সুদূর অতীতে তীক্ষ্ম-দন্ত এই উড়ুক্কু সরীসৃপদের ডানা-বিস্তার ছিল পঁচিশফুটেরও বেশি। দুঃস্বপ্নসম এই বিভীষিকারাই হয়ত দেশে দেশে পুরাণ উপকথায় দানবরূপ নিয়েছে—অতীতের স্মৃতিকে ধরে রাখবার প্রয়াসে।

সে তো সুপ্রাচীন সত্যকে কল্পকথার মাধ্যমে জিইয়ে রাখবার প্রচেষ্টা। কিন্তু ইদানীং যে সব উড়ুক্কু দানবদের প্রতিবেদন হামেশাই কানে আসছে—তাদের ব্যাখ্যা তো হচ্ছে না। তবে কি ধরে নিতে হবে, এ সব রিপোর্টের পেছনে বাস্তবতা আছে? মনগড়া ব্যাপার নয়—আকাশের আতঙ্করা সত্যিই করাল চেহারা দেখিয়ে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে?

যেমন ধরা যাক, নিউজার্সির 'জার্সি ডেভিল' কাহিনী। এদের রোমাঞ্চকর কথা জ্যানেট আর কোলিন বর্ড-এর লেখা 'এলিয়েন এনিম্যল' গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। অবিশ্বাস্য এই প্রাণীদের দেখতে নাকি প্রকাণ্ড সারসপাখির মত।

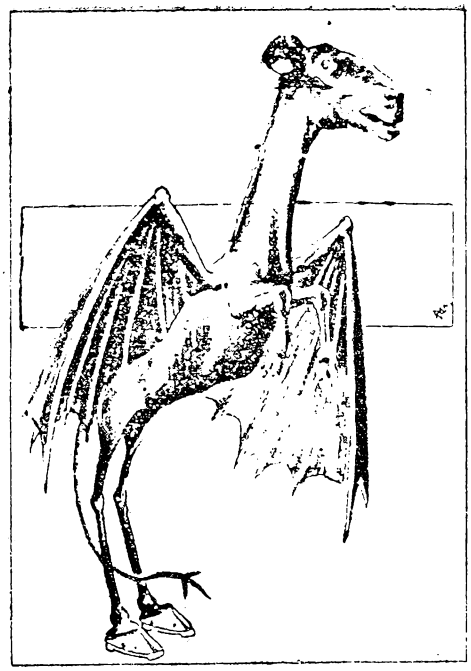

জার্সি ডেভিলের হাতে-আঁকা ছবি। 909 সালে নিউ জার্সির এক দম্পতি এই উড়ুক্কু বিভীষিকাটিকে দেখেছিলেন।

গলাখানা বেজায় লম্বা আর মোটা। পেছনের কলো লম্বা পায়ে আছে দুভাগে ভাগকরা খুর। সামনের খাটো পা দুটোয় আছে থাবা। ডানা বাদুড়ের ডানার মত—মেলে ধরলে প্রায় দু-ফুট বিস্তৃত হয়। মাথাটা ঘোড়া, কুকুর অথবা ভেড়ার মত। ল্যাজটা সুদীর্ঘ এবং চর্মসার।

আর এক ধরনের, আকাশ-দানবের খবর পরিবেশন করেছেন ফ্রাঙ্ক এইচ মেল্যাণ্ড তাঁর 'ইন উইচবাউণ্ড আফ্রিকা' গ্রন্থে। ভয়াবহ এই প্রাণীর নাম কোঙ্গামাটো। আকারে বলাচলে উড়ুক্কু গিরগিটি—চামড়া মসৃণ। চঞ্চুতে ঠাসা দাঁত। ডানা বাদুড়ের ডানার মত মেলে ধরলে চার থেকে সাত ফুট। শুনে কি মনে হয় না টেরোড্যাকটিলের আপনজন?

কোঙ্গামাটো অথবা জার্সি ডেভিলকে ইদানীং দেখা যাচ্ছে কম। কিন্তু যারা দেখেছে তারা হলফ করে বলেছে—চোখের ভুল নয়। নেসি আর সাসকোয়াচের মত ঘন ঘন দর্শনদান করলে এরাও অবশেষে 'সোসাইটি অফ প্রোবেবল মন্সটার'-য়ের আকাশে ওড়া সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত পেশ করতে পারে।

ওয়াশিংটন, টেক্সাস আর ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া থেকে এসেছে যে উড়ুক্কু দানবের রিপোর্ট, নাম তার 'মথম্যান'। জন এ কীল তাঁর 'দ্য মথম্যান প্রফেসিস' কেতাবে লিখেছেন এদের সম্পর্কে। অদ্ভুত এই ডানাগুলা প্রাণীদের আকৃতি নাকি মানুষের মত। গায়ের রঙ ধূসর। এদের দেখলেই

নাকি হাড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। একজন এমনই ভয় পেয়ে তার বর্ণনা দিয়েছিল এই ভাবেঃ

'এরকম ভয় জীবনে পাইনি। অলৌকিক শিহরণ বলা চলে। আঙুল নাড়াবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। এককথায় বলা চলে এই আতঙ্কর অস্তিত্ব না থাকলেই মানুষের মঙ্গল।'

অদ্ভুত ধূসর রঙের এই উড়ুক্কু মানুষের সঙ্গে উড়ন চাকি প্রহেলিকার নিগূঢ় সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। মানবসমাজে যদিচ কখনও আকাশীদানবের প্রয়োজন ঘটে, 'ইউ এফ ও' রা তো রইল!

দীপ্তি প্রিণ্টার্স, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা-১৪

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

কুসংস্কার—দয়াময় মাজী

ছোট বেলায় ঠাকুমার মুখে শুনতাম চাঁদের মধ্যে এক বুড়ি বটগাছের নিচে চরকা কাটে, তাকেই রাত্রি বেলায় চাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তখন ছোট বেলায় সে সব বিশ্বাস করতাম সরল মনেই। কিন্তু এখন জানি ঐ মনুষ্যাকৃতি দাগগুলো কোন বুড়ি নয়, ওগুলি পাহাড় পর্বত বা খাদের চিহ্ন। তাই দেখা যাচ্ছে মানুষ অজ্ঞতা বা ভুল চিন্তা ভাবনার ফলেই কুসংস্কার বিশ্বাস করে।

কোন ঘটনার কারণ বা ফলাফল সম্বন্ধে অবাস্তব বা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকেই কুসংস্কার বলা যায়। কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার দ্বারা ঐ বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করা হয় তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তাই ধারণা করা যায় বিজ্ঞানোন্নত বা সভ্য দেশে কুসংস্কার নেই। কিন্তু এধারণা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় সাধারণতঃ লোকেরা একটা দেশলাই কাঠিতে তিনজন সিগারেট ধরায় না। অনেকে আবার 'তের' সংখ্যাটিকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করে। তাই ডাইনিং টেবিলে তেরজন লোক বসে না।

আমাদের দেশেও অজস্র কুসংস্কারের দেখা মেলে। যেমন, বাইরে যাওয়ার সময় কেউ পিছু ডাকলে অনেকে তখন বাইরে বেরোয় না। এছাড়া হাঁচি, টিকটিকিতো আছেই। ভুতে পাওয়ার নামে হিস্টিরিয়া রোগীর উপর যে অত্যাচার করা হয় তা অবর্ণনীয়। তাছাড়া ডাইনি সন্দেহে হত্যার খবর এখনও শোনা যায়।

এসব তো ধর্মীয় সংস্কার। এছাড়া রাজনৈতিক বা সামাজিক কুসংস্কার অনেক আছে। সামাজিক কুসংস্কারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশের সতীদাহ প্রথা। রাজনৈতিক কুসংস্কারের উল্লেখযোগ্য ছিলেন হিটলার। তিনি ভাবতেন একমাত্র জার্মান জাতিই পৃথিবীতে খাঁটি আর্য। কিন্তু এ যে তার মিথ্যা দম্ভ সে আজ আমরা সবাই জানি।

এইভাবে বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কুসংস্কারের প্রভাব সর্ব ক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু তাইবলে সব সংস্কারকেই কুসংস্কার বলা যায় না। যেমন, হিন্দু ধর্মানুযায়ী কোন শিশুর মুখে ভাত ছয় মাস বয়সে হয়। এটাকে অনেকে কুসংস্কার বলে। কিন্তু বিজ্ঞান বলে যে শিশুর ক্ষেত্রে ছমাস বয়স পর্যন্ত মাতৃ-দুগ্ধই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। ছয় মাস পর শিশু জটিল খাদ্য হজম করতে পারে। তাই তখন থেকে তাকে ভাত খাওয়ানো যেতে পারে। অতএব এই সংস্কারটি কুসংস্কার নয়।

সুতরাং কুসংস্করের বিরুদ্ধে লড়তে হলে মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে হবে এবং একাজে এগিয়ে আসতে হবে বড়ো বিজ্ঞানী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকেও।

চাঁদড়া কল্যাণ সংঘ হরিজন বিদ্যালয়,
পোঃ—চাঁদড়া, জেলা—বাঁকুড়া।

সাগর গভীরে সমুদ্র / সৌরভ বাগচী

বিশ্বের প্রযুক্তিগত ও কৃৎ কৌশলের সফলতাকে শতাংশতে পৌঁছে দিতে চলেছেন ইঙ্গ ফরাসি বিজ্ঞানীরা ইংলিশ চ্যানেলের নীচে আর একটি চ্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে। সম্প্রতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ও ফরাসি প্রেসিডেণ্ট মিতেরাঁ আনুষ্ঠানিক ভাবে সে সুড়ঙ্গের কাজের উদ্বোধন করলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনা যেমন যুগান্তর আনছে তেমনি এ কথা বললে নিশ্চয়ই প্রসঙ্গান্তর হবে না যে তাঁরা কূটনৈতিক দিক দিয়েও দু দেশকে নতুন করে গাঁটছড়া বাঁধলেন। ভৌগোলিক দিক দিয়েও বলা যায় সমুদ্রের মধ্যে একটেরে পড়ে থাকা ইংল্যাণ্ড ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে এই পরিকল্পনায়।

বিজ্ঞানের প্রযুক্তির এক অনন্য, এক অসীম সৃষ্টি হতে চলেছে এটি। টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ পথ, সুয়েজ যোজক বা পানামা যোজক ইত্যাদি এ পর্যন্ত মানুষের তৈরি স্থাপত্যের সমস্ত কীর্তিকে ম্লান করে দেবে এ ঘটনা। একত্রিশ মাইল লম্বা এই সুড়ঙ্গ পথের নাম ফরাসিরা দিয়েছে লা ম্যাঁশে অথবা স্লিঙ। লোকমুখে তা অবশ্য এখন দাঁড়িয়ে গেছে চ্যানেল বা চুনেল। আর ইংরেজরা বলছে টানেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিনশো ফুট নীচে এ পথ ইউরোপিয় ভূখণ্ডে ফরাসি প্রান্তে ফেদান টারমিনালকে সংযুক্ত করছে ইংলণ্ডের শেরিটন টারমিনালের সঙ্গে। ডোভারের কাছে শেরিটন টারমিনাল থেকে লণ্ডনের দূরত্ব পড়বে 50 মাইল অন্যদিকে প্যারিস থেকে ক্যালের নিকটবর্তী ফ্রেদার্নের দূরত্ব 180 মাইল। যাত্রীরা ইচ্ছে করলে ক্যালে থেকে কানেকটিং ট্রেনে প্যারিস যেতে পারবেন।

টানেলটির মোট তিনটি অংশ থাকছে। প্রধান দুটি অংশ, যাদের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলবে তাদের ব্যাস হবে 24 ফুট। এর সঙ্গে স্টেশনে তৃতীয় একটি টানেল রাখা হচ্ছে 15 ফুট ব্যাসের। যাত্রীরা প্রধান সুড়ঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, ট্রেনে ওঠা, মালপত্র নামানো ইত্যাদি এই তৃতীয় সুড়ঙ্গটির মাধ্যমে করবেন। ইংলিশ চ্যানেলের নীচে খড়ির স্তূপ থাকার জন্য প্রযুক্তিবিদরা আশা করছেন যে সুড়ঙ্গের গাঁথনি যথেষ্ট নিরাপত্তাজনক করা সম্ভব হবে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে খড়ির স্তূপ পর্যন্ত প্রায় 176 ফুট গভীর এবং দ্বিতীয় অংশে খড়ির তলদেশে 124 ফুট। মোটামুটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তিনশো ফুট নীচে এই সুড়ঙ্গ স্থাপন করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতি 230 ফুট অন্তর একটি জরুরী নিষ্ক্রমণ পথ রাখা হচ্ছে। আগুন প্রতিরোধের জন্য গোটা টানেলটিকে ভেতর দিক থেকে মুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অ্যাসবেসটস শীট দিয়ে। ওপর থেকে স্টেশনে নামার জন্যে থাকছে স্বয়ংক্রিয় চলন্ত সিঁড়ি এবং লিফট। সুড়ঙ্গে রেলপথ খোলা হবে না, মোটর গাড়ি চলবে এ দিক নিয়ে বিতর্ক চলছিল ছ'মাস ধরে। থ্যাচার চাইছিলেন কেবলমাত্র মোটর গাড়িই চলুক। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মিতেরাঁ এবং থ্যাচার দুজনের দাবিই মেনে নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

লা ম্যাঁশেতে তিন মিনিট অন্তর একটি করে দোতলা ট্রেন ছাড়বে। দোতলা এই ট্রেনের নিচতলায় থাকবে মালপত্র আর মোটরগাড়ি ও ওপরের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবেন যাত্রীরা। ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে এ গাড়ি চলবে। অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ মিনিটেই চ্যানেল পেরিয়ে ফরাসিরা পৌঁছে যাবেন ইংলণ্ডে। কিন্তু এখানে বলে রাখা ভাল যে প্যারিস থেকে লণ্ডন পর্যন্ত পুরো যাত্রাপথ পেরোতে সময় লাগবে তিন ঘণ্টা।

যাত্রীদের টিকিট কাটা, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রতি নজর রাখা এবং নিরাপদে তাদের পৌঁছে দেওয়া সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করবে বিরাট একটি কমপিউটর ব্যবস্থা। সমস্ত পরিকল্পনার জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে সাড়ে ছয় মিলিয়ান ডলার বা বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা। এ হিসেবের মধ্যে আগামী বছরগুলোর মুদ্রাস্ফীতিকেও ধরা হয়েছে। যাত্রী ও গাড়ি বা মালপত্রর জন্য টিকিটের ভাড়া পড়বে মাথাপিছু তিরিশ ডলার করে। এতে প্রতি বছর আয় হবে নব্বই কোটি টাকা। এ চ্যানেল তৈরির জন্য শ্রমিক সমস্যার সামনেও বিজ্ঞানীদের পড়তে হচ্ছে না। বর্তমান ইংলণ্ডে বেকারত্বের পরিমাণ 13·2 শতাংশ এবং ফ্রান্সে 9.8 শতাংশ। পরিচালনায় ষাট হাজার শ্রমিককে ছয় বছরের জন্য পূর্ণভাবে নিয়োগ করা যাবে।

এই টানেল তৈরির জন্য বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ বা তাঁদের পুরোন সমস্ত জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছেন। টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গপথ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মার্ক ইসামবার্ড ব্রুনেলকে। ব্রুনেল সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন এক কেঁচো কলের সাহায্যে। বিদ্যুৎ চালিত রোটারি এসকাভেটরকে তার

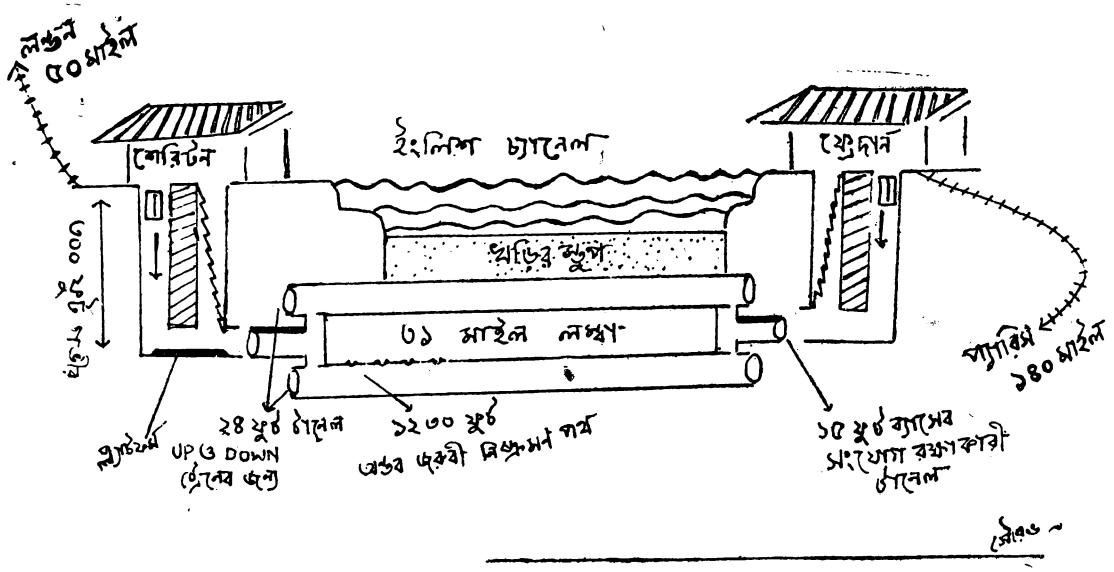

কার্য পদ্ধতির জন্য কেঁচো কল বলা চলে। এটি একদিক দিয়ে মাটি কাটতে কাটতে চলে আর অন্যদিক দিয়ে সে মাটি বার করে দেয়। মার্শি নদীর সুড়ঙ্গ কাটবার সময়ে জলের জন্য খুব অসুবিধা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে পাম্প করে বার করতে হয়েছিল 7,482,000 গ্যালন জল। 80,000 টনের লোহার চাদর দিয়ে লাইনিং দিতে হয়েছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি খুব খরচ সাপেক্ষ, সময় সাপেক্ষও বটে। লা ম্যাঁশে তৈরির সময় জলের বাধার সম্মুখীন হতেই হবে। বিজ্ঞানীরা পাম্প করে জল বার করার বদলে ওখানে 'কমপ্রেসড এয়ার সিসটেমের' সাহায্য নেবেন। 'কমপ্রেসড এয়ার' সিসটেম হল জলবন্দী অংশকে 'বায়ু নিশ্ছিদ্র' করে বাক্সর মতো আলাদা করে নেওয়া হয়। এবার ঐ অংশে প্রচণ্ড বায়ুর চাপে জল বার করে দেওয়া হয় ফলে এখানে খনকরা কাজ করতে পারেন। একই ভাবে তার সামনের অংশকে কমপ্রেসড এয়ার প্রেসার বা সঙ্কুচিত বায়ুর চাপে জলমুক্ত করা হয় এবং এইভাবেই তারা অগ্রসর হয়ে যাবেন। আমাদের পাতাল রেলের কাজ যখন বেলগাছিয়া অঞ্চলে মারাঠা খালের নীচে হচ্ছিল তখন সেখানেও ঐ একই পদ্ধতির সাহায্য ভারতীয় স্থপতিরা নিয়েছিলেন।

লা ম্যাঁশে তৈরির জন্য ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এই দুদেশের প্রযুক্তিবিদরা এক সঙ্গেই কাজে নামছেন। বিখ্যাত 'টাইম পত্রিকা' এই খবরটিকে এ শতকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক কাজ বলে বর্ণনা করেছে। দু দেশের বিজ্ঞানীরা আশা করছেন 1993 সালের মধ্যেই তাঁরা কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন, আর তা হলেই এ রেল গাড়িতে প্রতি বছরে চড়বেন প্রায় তেইশ লক্ষ মানুষ এবং তেরো কোটি টন মালপত্র।

45/4 চৌধুরীপাড়া লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-711 104

॥ লিমেরিক ॥

সজল চক্রবর্ত্তী

জলে জ'মে বরফের আয়তন বেড়ে যায়,

ঠাণ্ডার দেশে তাই বহু পাইপ ফেটে যায়।

এই সব তথ্য

মিথ্যা না সত্য—

ভেবে ভেবে অনেকের মিছে দিন কেটে যায়!

জুলে ভার্ন-এর
দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
রূপায়ণ- গৌতম কর্মকার

এবার যাত্রা জলপথে। রাত দুটোয় নৌকা গ্র্যান্টন বন্দরে পৌঁছলো।
এখন আমরা কোথায় চলেছি?
হোলিরুড - স্কটল্যান্ড রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদ।
ঐ দেখো, একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে সুবিশাল থাম, একি- চোখগুলো পিট পিট করছো কেন?
সকাল হচ্ছে, তাই না?
হ্যাঁ নেল, সূর্য উঠছে।
আর্থার্স সীট-এর চূড়ায়...
উঃ- আলো, এতো আলো! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।
নেল, পশ্চিমের দিকে তাকাও।
ওগো না, না, আমাকে সইতে দাও, আমাকে দেখতে দাও।
আরও খানিক পর...
হে ভগবান, কী অপূর্ব তোমার সৃষ্টি!
অবশেষে ফিরে যাবার পালা...
এখন আমরা কোথায় যাবো হ্যারি?
রব রয়ের দেশ... আটচল্লিশ ঘন্টা পরে আমরা কয়লা-নগরীতে ফিরবো।

বেলা তিনটে, আধ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে জাহাজঘাটা।
সত্যি, যা দেখলাম, তা কোনও দিন ভুলতে পারবো না।
ঈশ্বর সাক্ষী, নেল - বলো, তুমি আমার হবে? আমার স্ত্রী।
তুমি যদি তাতেই সুখী হও, তবে তাই হোক। এ যে আমার সৌভাগ্য!
তীরভূমি থেকে 'রব রয়' তখনো এক কিলোমিটার দূর, হঠাৎ--
একি! স্টিমারটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো কেন? ধাক্কা লাগলো মনে হচ্ছে!
হা ভগবান, ওটা কী? একটা প্রবল ঘূর্ণি। লক ক্যাটারিনের জল তরতর করে নেমে যাচ্ছে। এখন উপায়?
স্টীমবোট আর একটুও নড়ছে না।
সর্বনাশ হয়ে গেল হ্যারি। লক ক্যাটারিনের তলায় হঠাৎ ফাটল ধরেছে। সব জল বিপুল বেগে নেমে যাচ্ছে নিচের কয়লা-খনিতে।
গেল! গেল! সব গেল! নিউ অ্যাবারফয়েল জলের তলায় চাপা পড়ে গেল! আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব গেল! হা ঈশ্বর, এই তোমার মনে ছিল!
৩৭

অনেক নিচে খনিগর্ভ তখন গমগম করছে কাজের ছন্দে। ডিনামাইটের বিস্ফোরণ, কয়লা পাথর ভেঙে পড়ার আওয়াজ, ড্রিলিং মেশিনের ঘরঘর শব্দ—নিউ অ্যাবারফয়েলের দুরন্ত যৌবন যেন প্রাণের উল্লাসে ঝলমল করছে। হঠাৎ প্রলয়ঙ্কর একটা গর্জন। আচম্বিতে একটা সুবিশাল জলপ্রপাত যেন ভেঙে পড়লো খনির গর্ভে।
পাতাল-নগরী কেঁপে উঠলো সেই ভয়াবহ শব্দে। ফুলে ফেঁপে উত্তাল হয়ে উঠলো লক ম্যালকমের জলরাশি। তীরের বাঁধন ভেঙে ফেলে জল আছড়ে পড়লো কটেজের দেওয়ালে।
চারপাশে একটা আতঙ্কিত কলরব—গেল, গেল, সব গেল!
সর্বনাশ—একি! পালাও—পালাও সব।
আহ—বাঁচাও! বাঁচাও!
পালাও—পালাও সব। আরও উঁচুতে ওঠো।
ওহ, কী আশ্চর্য কান্ড! এ তো জল কোথা থেকে আসছে?
বাঁচবার একমাত্র উপায় সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে মাটির উপরে উঠে যাওয়া।
অসম্ভব, তা পারবে না। ক্যালেডোনিয়ান ক্যানাল পর্যন্ত খনির বিস্তার। সমুদ্র যদি নেমে আসে তাহলে ডুবে মরতে আমাদের হবেই।
কিন্তু তা নয়। ঐ দেখ—জল কমছে। বিপদের আশঙ্কা আর নেই।
জেমস স্টার ফিরে এলেন তাড়াতাড়িই।
তোমার কি মনে হয় হ্যারি—দুর্ঘটনাটা প্রাকৃতিক?
অসম্ভব স্যার, এ সেই অদৃশ্য শত্রুর নষ্টামি। ঐ দেখুন স্যার—সামনে…
40

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

নিত্যগোপাল বসু

তেজস্ক্রিয়তা বললেই মনে পড়ে পরমাণু বোমা কবলিত নাগাসাকি-হিরোসিমার কথা কিংবা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দুর্ঘটনার থ্রিমাইল আইল্যান্ড বা চেনোবিলের বিপর্যয়ের কথা। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অনেক মূল্যবান ব্যবহার আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করা হয় মূলতঃ রোগ নির্ণয়ে ও রোগ নিরাময়ে।

পরমাণুর প্রাথমিক ধারণা ঃ

এটা সবার জানা যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হল পরমাণু যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। পরমাণু প্রধানতঃ নিউক্লিয়াস এবং এক বা একাধিক কেন্দ্রবেষ্টিত ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াস তৈরি হয় শুধু প্রোটন বা প্রোটন ও নিউট্রন কণার দ্বারা। নিউক্লিয়াসে নিউট্রন কণার সংখ্যা প্রোটন কণার চেয়ে যত বেশি হয় তত নিউক্লিয়াস ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তখন ঐ মৌলটি কতকগুলো রশ্মি বিকিরণ করতে শুরু করে। পদার্থ বিজ্ঞানে এরাই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। বিকিরিত রশ্মি তিন প্রকারের—আলফা, বিটা ও গামা। আলফা ও বিটা রশ্মি জীবিত কোষকলা ভেদ করে খুব বেশি দূর যেতে পারে না। তবে গামা রশ্মির ভেদ্যতা খুব বেশি।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ধর্ম ঃ

1. ভেদ্যতা ঃ আলফা কণার ভেদ্যতা খুবই কম—2 মিলিমিটারের মতো। বিটা রশ্মির বেলায় এটা আরো একটু বেশি (4-5 মিমি)। তবে গামা রশ্মি জীবিত কোষকলার গভীরে সহজে প্রবেশ করতে পারে। বিটা রশ্মি বিকিরণকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগানো হচ্ছে। কেননা, কোষকলায় এই রশ্মি সহজে শোষিত হয়। অন্যদিকে জীবিত কোষকলায় গামা রশ্মি শোষিত হয় না বলে কোষকলায় এর ভেদ্যতা খুব বেশি। তাই সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শরীরে প্রবেশ করিয়ে, শরীর থেকে কি পরিমাণে ও কোথা থেকে গামা রশ্মি বেরিয়ে আসছে তা মেপে অনেক খবরাখবর পাওয়া সম্ভব।

2. আয়নিতকরণ (ionization)—বিটা রশ্মি ও আলফা রশ্মির মতো আহিত কণা যখন অন্য পরমাণু নিকটবর্তী হয় তখন স্থিরতাড়িতিক বলে (electrostalic force)…এর ফলে অণু পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথের ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটে। ফলে ঐ অণু বা পরমাণুটি সামগ্রিকভাবে ধনতাড়িতে আহিত হয়। ইলেকট্রন ও ধন-তাড়িতাহিত পরমাণু যৌথভাবে জৈব বিক্রিয়ায় (Biological effect) অংশ গ্রহণ করে। গামা রশ্মি ও নিউট্রন কণা আধানবিহীন বলে সরাসরি অন্য পরমাণুকে আয়নিত করতে পারে না। তবে কোষকলার সংস্পর্শে আসার সময় এরা দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলেকট্রন (Secondary electron) উৎপন্ন করে। এই ইলেকট্রন কণারাই বিটা রশ্মির মতো জৈব কোষকলায় জৈব বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

3. তেজস্ক্রিয়তা ফটোগ্রাফি ফিল্মে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

4. জৈব কোষকলার সংস্পর্শে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ তাপ উৎপন্ন করে। রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত বা মন্দিভূত করে। জারণ বা বিজারণ ঘটায়।

5. গামা রশ্মি ও এক্সরশ্মি কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের ওপর পড়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তেজস্ক্রিয় বস্তুর উপস্থিতি সরাসরি প্রত্যক্ষ করা চলে ফ্লুওরোস্কোপি ও সিন্টিলেশন-গণকের সাহায্যে।

6. অর্ধায়ু (Half life) ঃ শরীরে কোনো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রবেশ করালে যে সময়ে প্রাথমিক তেজস্ক্রিয়তার অর্ধেক তেজস্ক্রিয়তায় পেঁছায় তা হল জৈব অর্ধায়ু (Biological Half life)। এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শ্বাসবায়ু, প্রস্রাব ও পায়খানায় দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আবার শরীরের কোষকলায় সঞ্চিত হয়। আবার এক এক কোষকলা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক এক পদার্থের ওপর অধিক টান (affienety) দেখা যায়। সুতরাং ঐ পদার্থগুলো কতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকবে তা পদার্থ অনুযায়ী আলাদা আলাদা। তেজস্ক্রিয় অর্ধায়ু মেপে ঐ সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হবার হার (Rate) বের করা সম্ভব।

রোগানুসন্ধানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপঃ

মোটামুটিভাবে লোহিত কণার জীবনকাল হল গড়ে 120 দিনের মতো—কিছু কিছু অসুখে এই জীবন কাল কমে। লোহিত কণার জীবন সীমা জানার জন্য ব্যবহার করা হয় রেডিও আইসোটোপ ক্রোমিয়াম—51। খাদ্যনালীর ক্ষতে (peptic ulcer) বা ক্যানসারে ক্রমাগত অথচ সামান্য পরিমাণে রক্তক্ষরণ হতে থাকে যা সাধারণ পরীক্ষায় সহজে ধরা পড়ে না। এমন ধরনের রক্তপাত—সে যত সামান্যই হোক না কেন—ধরা পড়ে ক্রোমিয়াম-51 আইসোটোপ ব্যবহার করে।

রক্তের হিমোগ্লোবিনের অন্যতম ধাতব উপাদান হল লৌহ। এটা শোষিত হয় খাদ্য নালীতে। জমা হয় যকৃত (Liver), প্লীহা (Spleen) কিংবা অস্থিমজ্জায় (Bone marrow)। রক্তের উৎপাদন হয় অস্থিমজ্জায়। লৌহের বিপাকে (metabolism) কোনো অসুবিধা ঘটলে দেখা দেবে রক্তাল্পতা (anaemia), আর এটা বুঝতে, ও কারণ নির্ণয় করতে আয়রন 59 আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। রক্তকণা উৎপাদনের জন্য দরকার হয় ভিটামিন-বি 12 ও ফোলিক এ্যাসিড। এদের অভাবেও রক্তাল্পতা হতে পারে। তা নির্ণয়ের জন্য যথাক্রমে কোবাল্ট 57 ও ট্রিটিয়াম 3 আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস ও মস্তিষ্ক দিয়ে কি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা জানার জন্য ক্রিপটন-85 কে কাজে লাগানো হচ্ছে। হৃদপিণ্ড প্রতিটি সংকোচনে কি পরিমাণ রক্ত পাম্প করছে কিংবা প্রতি মিনিটে তার কর্মক্ষমতা কত তা জানার জন্য ব্যবহার করা হয় আয়োডিন 131 যুক্ত এ্যালবুমিন (radio iodine labelled Human Serun Albumin সংক্ষেপে, RIHSA)।

মস্তিষ্কের টিউমারের অস্তিত্ব নির্ণয়ে বিশেষতঃ তার সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয়তাকে ব্যবহার করা হয়। এ কাজে নিও হাইড্রিন (Neohydrin) ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এতে থাকে তেজস্ক্রিয় মার্কারী 203 অতিরিক্তভাবে মেশানো হয় গামা রশ্মি বিকিরণকারী গ্যালিয়াম-68 ও টেকনিসিয়াম-99 এর আইসোমার। সিন্‌টিলেশন ক্যামেরা (Scintilation Camera) অথবা মালটিপল ডিটেকটার স্ক্যানার-এর (multiple Detecter Scanner) সাহায্য নিয়ে ঐ টিউমারের অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয় করা সহজ হয়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আয়োডিন-131 ও আয়োডিন-132 থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান নির্ণয়ে, কাজের ধরন ধারণ নির্ণয়ে ও টিউমার বা ক্যান্সারের অস্তিত্ব বের করতে অপরিহার্য। বৃক্কের (kidney) অবস্থান নির্ণয়ে মার্কারী-203 যুক্ত ক্লোরমেরোড্রিন (Chlormerodrin) এবং কিডনীর কার্যক্ষমতা জানা ও আয়োডিন-131 যুক্ত সোডিয়াম-আয়োডা-হিপ্পুরেট (Sodium-iodo-hippurate) যৌগ ব্যবহার করা হয়। কোন কোষকলার টিউমার ও ক্যান্সার নির্ণয়ে স্ক্যান (Scann) করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইণ্ডিয়াম-113 দিয়ে যকৃত, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক, বৃক্ক এবং অস্থিমজ্জার স্ক্যান করা হয়। যকৃত, প্লীহা ও মস্তিষ্কের স্ক্যানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে টেকনিসিয়াম-99 ; 75 সেলেনোমিথোনিয়াম প্যারাথাইরয়েড ও প্যাংক্রিয়ান স্ক্যানিং এর জন্য উপযুক্ত।

শরীরে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইডের কার্য প্রকৃতি ও বিপাকক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানের জন্য ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম ক্লোরাইড (24-NaCl) ও তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম ক্লোরাইড (42-KCl) ট্রিটিয়াম সংযুক্ত জল (T_2O) ব্যবহার করা দেশে জলের বিপাকক্রিয়া জানতে।

রক্তের অন্যতম উপাদান হল প্রোটিন। এটা উৎপন্ন হয় যকৃতে। আর এর জন্য প্রয়োজন এ্যামিনো এ্যাসিড (amino acids)। যকৃতের অসুখে প্রোটিনের উৎপাদন কমে। আবার উৎপাদন যদি বা অব্যাহত থাকে, কিডনীর কিছু কিছু অসুখে ঐ প্রোটিন বা এ্যামিনো এ্যাসিড প্রস্রাবে নির্গত হয়। এমনতরো প্রোটিন বিপাকের ত্রুটি নির্ণয়ে আয়োডিন-131 যুক্ত এ্যালবুমিন ও কার্বন-14 অথবা সালফার-35 যুক্ত এ্যামিনো এ্যাসিডের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শরীরের বিভিন্ন হর্মোন যেমন ইনস্যুলিন, এ. সি টি এইচ (A.C.T.H), বৃদ্ধি সহায়ক হর্মোন, গোনাডো, ট্রপিন প্রভৃতির ক্ষরণের হার নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই পদ্ধতিকে বলে—Radio-assay। নতুন নতুন কার্যপ্রণালী, ক্ষতিকর দিকসমূহ জানার জন্যও আজকাল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে।

রোগ নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

থাইরয়েড গ্রন্থির অতি ক্ষরণে (Hyperthyroidism) কিংবা ক্যান্সারে আয়োডিন-131 ব্যবহার করা হয়। পিটুইটারী গ্রন্থির ক্যানসার ও টিউমারে ইট্রিয়াম-90, লোহিত কণিকার ক্যানসারে (Polycythemia Vera) রেডিও ফসফোরাস-32, বহুল ব্যবহার হচ্ছে। মূত্রস্থলীর ক্যানসারে ট্যানটালাম-182 বেশ ফলদায়ী। রেডিও কোবাল্ট, রেডিও গোল্ড ব্যবহৃত হয় জরায়ু ও স্তনের ক্যানসারে।

মানবদেহে কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ কতখানি প্রয়োজন, কি তাদের কাজ—এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য যোগাতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহারের নতুন নতুন দিক সংযোজন হচ্ছে—যা বুঝতে সাহায্য করছে অত্যন্ত জটিল মানব দেহের বিভিন্ন জৈব বিক্রিয়া ও পরিবর্তন। এক কথায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেডিও আইসোটোপ উন্মোচন করেছে এক নতুন দিগন্ত।

পিরামিডের কথা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

পিরামিড হচ্ছে প্রাচীন মিশরের রাজা ও ধনবান ব্যক্তিদের সমাধি-মন্দির। প্রাচীন পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য ছিল এই পিরামিড। প্রকাণ্ড চৌকোণা পাথরের খণ্ড একটার উপর আর একটা গেঁথে উপরের দিকটা ক্রমশঃ সরু করা হয়েছে। এক একটা পিরামিড গড়ে তুলতে এই রকম লক্ষ লক্ষ পাথর খণ্ড লেগেছে। এই পাথর খণ্ডগুলি অসম্ভব ভারী আর কি করে এগুলো উপরে উঠিয়ে পর পর গাঁথা হত তা কল্পনা করাও কঠিন।

প্রাচীন মিশরের রাজারা ছিলেন প্রচুর ধন সম্পদের মালিক। রাজারা তাঁদের জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুর সমাধি নির্মাণ করতেন। পিরামিড হচ্ছে সেই সমাধি মন্দির—যার মধ্যে রাজার মৃতদেহ ওষুধপত্র দিয়ে এমন ভাবে রাখা হত যাতে সেটা নষ্ট হয়ে না যায়। এই মৃতদেহের নামই হচ্ছে—মমি। মমির সাথে নানা রকম ধনরত্ন, স্বর্ণালঙ্কার এবং জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামই রেখে দেওয়া হত। অনেক সময় এই সব ধনরত্নের লোভে দস্যুর দল পিরামিড লুঠতরাজ করত। তাই ডাকাত ও দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পিরামিডের মধ্যে গোলক-ধাঁধার পথ থাকত—যাতে দস্যুরা ধনরত্নের আসল জায়গাটা খুঁজে না পায়। তবুও বহু পিরামিডের ধনরত্ন দস্যুরা লুঠ করেছে।

সে যাই হোক, আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে, যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি তখন মিশরবাসীরা কি উপায়ে মমি তৈরি করত, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ লর্ড কারনারভন ও হাওয়ার্ড কার্টার বালক রাজা তুতানখামেনের মমি আবিষ্কার করেছিলেন। এই মমির সঙ্গে আরও পাওয়া গিয়েছিল বহুমূল্য সব রত্নরাজি। তুতানখামেনের মমির গলায় শুষ্ক মালাটিও বিশেষ ভাবে দর্শকদের মন আকর্ষণ করে।

মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করা—শুধুমাত্র চিকিৎসা ও রসায়ন বিদ্যার কেরামতিই নয়, উন্নত ও সূক্ষ্ম শিল্প-কর্মও বটে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিশরে সাধারণ লোকের মৃত্যু হলে তাকে পশু চর্মে জড়িয়ে তারপর মাটিতে অগভীর গর্ত করে কবর দেবার ব্যবস্থা ছিল। মরুভূমির বালি ঐ মৃতদেহকে ক্ষয় ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করত। বাতাস ও জীবাণুর সংস্পর্শে আসার সুবিধা না হওয়ায় মৃতদেহ বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকত। মিশর-বাসীদের ধারণা হল জীবন হল পান্থশালা, অল্প দিনের জন্য থাকার জায়গা। আর মৃত্যু হচ্ছে—অনন্ত ভুবন, চিরকালের আশ্রয়স্থল। সুতরাং মৃত্যুর পরেও মানুষের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য তৈজসপত্র প্রয়োজন। তাই তারা

মৃতদেহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও নানা প্রকার ভোগ-বিলাসের দ্রব্য দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করল।

কিন্তু সমাধিস্থলে অনেকটা জায়গা থাকায় সেখানে বাতাসের ছোঁয়ায় মৃতের পরমায়ু অনেকটা কমে গেল। তখন সবাই চিন্তা করতে শুরু করল কিভাবে মৃতদেহকে বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা যায়।

কিভাবে মমি তৈরি হত সে বিষয়ে এবার বলছি। মমি তৈরির পদ্ধতিটা মোটেই সহজ নয়—বরং বলা চলে বেশ জটিল। মমি তৈরি করার জন্য অবশ্য বিশেষ ভাবে নির্মিত ঘর (kiosk) দরকার হত। সর্ব প্রথম মস্তিষ্ক থেকে ঘিলু বের করার রেওয়াজ ছিল। তারপর তলপেটের বাঁ-দিক চিরে হার্ট বাদে ফুসফুস, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্র, লিভার ইত্যাদি দেহযন্ত্র সমূহ বের করে ফেলা হত। হার্টকে নানারকম তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আস্তরণ লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হত। তারপর দেহের অভ্যন্তর ভাগ ভাল করে ধুয়ে একটা বিরাট পাত্রে লবণ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হত। এই পদ্ধতিতে দেহের চর্বি জাতীয় বস্তু গলে বেরিয়ে আসত এবং বাইরের চামড়াও উঠে যেত। হাত ও পায়ের নখে ধাতু নির্মিত খাপ লাগিয়ে দেওয়া হত। দিন সাতেক বাদে মৃত দেহটি লবণ জলের দ্রবণ থেকে বের করে নিয়ে শুকিয়ে নিতে হত। তারপর নানারকম মশলা (যেমন রজন, নেট্রন ইত্যাদি) দিয়ে মস্তিষ্ক ও শরীরের শূন্য স্থান ভরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। চর্বি আর রজন দিয়ে এক রকম মলম জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হত। ঐ মলম সারা গায়ে মাখিয়ে তারপর একটা লিনেন কাপড় দিয়ে মৃতদেহকে জড়িয়ে রাখা হত। লিভার, ফুসফুস এই সব ভাল করে মশলা মাখিয়ে যথা-স্থানে ঢুকিয়ে দেহকে রং করা হত। চক্ষু কোটরে কৃত্রিম চোখ বসিয়ে ঠোঁটে আর গালে লাগান হত লাল রং।

অনেক সময় পাখি, কুমির, মাছ, ষাঁড়, কুকুর—বেড়ালকেও মোটামুটি এই একই রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে মমি করা হত। সবচেয়ে প্রাচীন মমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে Fezzan-এ। এই মমি প্রায় ছয় হাজার বছরের প্রাচীন।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

কুসংস্কার—অরিন্দম দাস মাজী

হঠাৎ কী হলো বাবার ? দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবেশীরা বললেন, কারোর কুদৃষ্টি পড়েছে। পথের বেড়িয়ার নিতাই 'ভরযোগে' বললে, ডাইনী বুড়ি রক্ত চুষে খাচ্ছে। মা-ঠাকুমা দেবতা-উপদেবতার দোরে ধর্না দিলেন। মাদুলি-তাবিজ পরালেন। কিছুই হয় না। হায়! বিংশ শতাব্দী, মহাকাশ জয় করেছ; আদ্যিকালের কুসংস্কার মন থেকে দূর করতে পারনি। ভক্তিবাদের কাছে যুক্তিবাদ হার মানছে।

চার্চ বললে জোয়ান ডাইনী। তার মৃত্যুদণ্ড হলো। মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিক ধারণা এখনো আছে—সারা পৃথিবী জুড়ে। মানুষ এখনো মানছে গুপ্ত-মন্ত্র, ডাকিনী-যোগিনী, ভূত-প্রেত; বার বেলায় যাত্রা কালোবিড়াল, তেরো সংখ্যা, পেঁচা অশুভকর। 1978 সালে মালদার এক শিক্ষক বাবা মায়ের মৃত্যু, ভাইপোর অসুখ, স্ত্রীর পাগলামি ডাইনীকৃত মনে করলেন। অভিযুক্ত দুই মহিলা প্রাণ হারালেন। খোঁপরা মুমূর্ষ ডাইনী-অভিযোগে খুন হলেন ছেলের সামনে। পুরুলিয়ার প্রমীলা পরামাণিক ডাইনী বুড়ি। অশুভকর অন্ধবিশ্বাসই কুসংস্কার। শুধু-এদেশে নয়, চীন, ইংলণ্ড, নিউজীল্যাণ্ড, আমেরিকায় কুসংস্কার আধিপত্য করছে।

বিজ্ঞান বলে, কারণ ছাড়া কার্য অসম্ভব। বাবার শুকিয়ে যাওয়ার মূলে কারণ অবশ্য বর্তমান। ডাইনীর পক্ষে রক্তশোষণ সম্ভব কিনা যাচাই করা প্রয়োজন। গিরগিটি বর্ণ বদলায়। লালমুখো কৃকলাস রক্ত খাচ্ছে, ভয়ে বুকে থুতু দিই। অথচ স্বচ্ছ চামড়ার তলায় লাল, হলুদ, কালো রঞ্জক-পূর্ণ কোষগুলির প্রসারণ-সঙ্কোচনই রঙ পরিবর্তনের কারন। নিছক বিশ্বাস নয়, চাই অনুসন্ধিৎসা।

দাদামশায়ের পরামর্শে বাবা ছুটলেন হসপিটালে। পরীক্ষায় ধরা পড়লো অসুখ। গলায় আঘাত লেগেছিল। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড-অকেজো হয়েছে। 'থাইরোটক্সিকোসিস' রোগের প্রতিষেধক 'নিও-মার্কাজোল' ট্যাবলেট প্রয়োগে সেরে উঠলেন।

বারোজন অনুচরের সংগে নৈশভোজ খাওয়ার পরদিন যীশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন বলেই "তেরো-সংখ্যা"—অমঙ্গল জনক ? বৃহস্পতিবারের বারবেলায় শিলং যাত্রা করেই রবীন্দ্রনাথ অসুবিধায় পড়লেন, সুতরাং বারবেলায় যাত্রা নিষিদ্ধ হবে ? লা ভাদ্র অগস্ত্য যাত্রা,—যাত্রা করলে নিখোঁজ হবেন ? যাচাই করুন।

মানুষের অজ্ঞতা, প্রাকৃতিক ঘটনায় ভয়, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের মূল। বিজ্ঞানে অলৌকিকতা অস্বীকৃত। তবু বিজ্ঞান শিক্ষক রোগে নিরাময়ে, বিপদতারণে মাদুলি-তাবিজ পরেন। অর্জিত বিদ্যা ও ব্যবহারে বিস্তর ব্যবধান। যা জানি মানিনা, যা মানি কেন মানি জানি না। লোকাচার চলার পথকে করছে রুদ্ধ। বিজ্ঞানের আলো মনের অন্ধকারকে এখনো দূর করতে পারেনি। তবু চেষ্টা চালাতেই হবে। একদিন বিজ্ঞান অজ্ঞতা ও ভয়কে করবে জয়।

রানিয়া কুলটুকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ রানিয়া গোন্দপুর জেঃ দঃ 24 পরগনা 743318।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত সপ্তম/অষ্টম গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

কুসংস্কার কুংসস্কারই

ভুবনেশ্বর মণ্ডল

শীতের রাত্রি। ভোর হতে বিলম্ব নেই বেশি। গ্রামের জনসমূহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সহসা রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে ক্রন্দন রোল ওঠে গুটিকয় বামাকণ্ঠের। চারিদিকের গৃহের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জাগরিত হয়। সবার মুখেই একই কথা—'যাঃ তিনদিন ধরে সান্তার দাদু টাইফয়েডে ভুগছিল। সে বোধহয় দেহ রেখেছে।' সকলেই এখন ক্রন্দন অনুসরণকারী।

ছোট্ট গ্রাম। অধিকাংশই নিরক্ষর। মাত্র কয়েকজন ছাত্র পড়ে মাইল খানেক দূরবর্তী একটি গ্রামের স্কুলে। তাদের মধ্যেই ফটিক নামক জনৈক ছাত্র সান্তাদের জ্ঞাতি। বয়স চৌদ্দর মাঝামাঝি। সেও যায় ঐ বাড়িতে।

গ্রামের লোকেরা তখন মৃতদেহ সহ শ্মশানে গিয়েছে। এদিকে অপর জ্ঞাতিদের মধ্যে তখন হাঁড়ি-কড়া পরিষ্কারের তাণ্ডব। যে যার রান্নায় ব্যবহৃত মাটির পাত্র বর্জন করে।

ফটিকের মা তখন বাড়ি ছিল না। গৃহে মহিলা বলতে অপর কেহ নেই। ঐ দিনেই ফটিক একটি মৃৎপাত্রের ব্যবহার শুরু করেছে। সে কিন্তু তা বর্জন করেনি। প্রতিবেশীরা তাকে শুনাল 'জ্ঞাতি মারা গেলে পালন না করলে পেটে মরে শোধ তুলবে।' ফটিক মুখে বলল 'ঠিক আছে।'

বিদ্যালয়ে সে শিক্ষকদের মুখে শুনেছিল—'চারিদিকের সকলেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এগুলো কুসংস্কার মাত্র। অতএব সে তার রান্নার দ্রব্যগুলি পুনর্বার ব্যবহারের জন্য রাখিল। কোনরূপ পরিষ্কারও করিল না, বর্জনও করল না। পাড়ার লোকে 'হাঁড়ি ফেলেছে কিনা' জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ফিনিস।' তার ইংরাজির জোরে সে আর দ্বিরুক্তি করল না।

আবার যখন মৃতের মুখাগ্নি শেষ করে গুটিকয় গ্রাম্যলোক গঙ্গাযাত্রা শুরু করেছে তখন আবার জ্ঞাতিদের মধ্যে নানা বিধির ঝড় উঠল, তেল বিনা স্নান করে মাথা না আঁচড়ে থাকতে হবে। ক্ষৌরকার্য এক মাসের জন্য নিষিদ্ধ। সেদিন উনুন জ্বালা নিষেধ ইত্যাদি। ফটিক দেখল এগুলি কুসংস্কার মাত্র। সেদিন আবার তার শারীর বিদ্যা পরীক্ষা। অতএব স্কুলে যেতেহবে। তাই সবার অজ্ঞাতে ফটিক ভাত চড়িয়ে দিল। স্নান শেষে মাথা আঁচড়ে ভাত খেয়ে স্কুলে গেল। অপর গৃহে সেদিন উনুন জ্বলেনি। চলেছে সপরিবারে উপবাস। আশা করি এখন সকলেই বুঝেছে কুসংস্কার কুসংস্কারই। তাই এর জন্য ফটিককে কোনকালেও ফলভোগ করতে হয় নি।

প্রযত্নে—ধরাধর মণ্ডল গ্রাম-গোপালনগর, বীরভূম।

ইলেকট্রনিকস্ ক্যুইজ Part II.

বিপ্লব ব্যানার্জী

প্রশ্ন সংখ্যা—12 সময়—6 মিনিট

1. এক কথায় ইলেকট্রনিকস্ বলতে কি বোঝায়?

(a) বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, (b) ইলেকট্রন কণিকা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, (c) এক ধরনের বিজ্ঞান শাস্ত্র যে শাস্ত্রে ইলেকট্রন কণিকার গুরুত্ব খুব বেশি।

2. ইলেকট্রন কণিকার আবিষ্কারক কে?

(a) Millikan, (b) F. W. Aston, (c) Jean B. Perin, (d) J. J. Thomson.

3. একটি ইলেকট্রন কণিকার আধান কত?

(a) 6.1×10^{-14} কুলম্ব, (b) $3{\cdot}8 \times 10^{-19}$ কুলম্ব, (c) $1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব।

4. ইলেকট্রন কণিকার আবিষ্কার হয় কোন সালে?

(a) 1905 সালে, (b) 1897 সালে, (c) 1911 সালে (d) 1937 সালে, (e) 1893 সালে।

5. একটি ইলেকট্রন কণিকার ভর কত?

(a) $4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ গ্রাম, (b) $1{\cdot}675 \times 10^{-24}$ গ্রাম, (c) $9{\cdot}11 \times 10^{-28}$ গ্রাম, (d) 3×10^{-9} গ্রাম

6. ইলেকট্রন এক ধরনের,—(a) ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণিকা, (b) ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণিকা, (c) নিস্তড়িৎ বা শূন্য আধানযুক্ত কণিকা।

7. ইলেকট্রন কণিকার ব্যাস কত?

(a) $5{\cdot}598 \times 10^{-13}$ সেণ্টিমিটার, (b) $1{\cdot}135 \times 10^{-12}$ সেণ্টিমিটার, (c) $6{\cdot}019 \times 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার।

8. একটি ইলেকট্রন কণিকার আয়তন কত কিউবিক সেণ্টিমিটার? (a) 92×10^{-39} c.c, (b) 89×10^{-41} c.c, (c) $0{\cdot}5 \times 10^{-33}$ c.c

9. যে তড়িৎদ্বার ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত বা emit করে তাকে বলা হয়, (a) Anode, (b) Cathode, (c) Grid

10. নীচের (a), (b) ও (c) এই তিনটি বাক্যের কোনটি ঠিক? (a) যে কোন মৌলেই ইলেকট্রন কণিকা থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই (b) যে কোন মৌলেই একাধিক ইলেকট্রন কণিকা থাকিবে। (c) ইলেকট্রন কণিকা সকল মৌলের এক সাধারণ উপাদান

11. ক্যাথোড রশ্মি বস্তুত পক্ষে

(a) প্রোটন কণিকার স্রোত, (b) তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ (c) ইলেকট্রন কণিকার স্রোত, (d) নিস্তড়িৎ কণিকার স্রোত

12. চারটি একই ধরনের Electron Tube মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ দেওয়া হইল। কোনটির মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবেগ সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

(a) $1{\cdot}1 \times 10^{-3}$ মিলিমিটার পারদ চাপে, (b) 1 মিলিমিটার পারদ চাপে, (c) $3{\cdot}6 \times 10^{-6}$ মিলিমিটার পারদ চাপে, (d) 2×10^{-4} মিলিমিটার পারদ চাপে।

[উত্তর 53 পৃষ্ঠায়]

17, যাদব ঘোষ রোড সরশুনা কলকাতা-61

নাইট্রোজেন / অমরনাথ রায়

পর্যায়সারণীর সাত নম্বর মৌলটির নাম নাইট্রোজেন, যার চিহ্ন N, পরমাণু ক্রমাঙ্ক 7, পারমাণবিক গুরুত্ব 14·008, ইলেকট্রন বিন্যাস $1S^2\ 2S^2\ 2P^3$. গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের ঘনত্ব প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 1·25046 গ্রাম / লিটার, কঠিন নাইট্রোজেনের ঘনত্ব 1·14 গ্রাম / সি. সি. কঠিন নাইট্রোজেনের গলনাঙ্ক = −210°C, স্ফুটনাঙ্ক = −195·8°C এবং তড়িৎ ঋণাত্মকতা পলিং স্কেলে) = 3·0

বায়ুর আয়তনের পাঁচ ভাগের মধ্যে চার ভাগই হলো নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন শব্দটা ল্যাটিন শব্দ nitrogenium (যার অর্থ সল্টপিটার গঠনকারী) থেকে এসেছে। পর্যায়সারণীর দ্বিতীয় পর্যায়ে VB শ্রেণীর প্রথম মৌল হলো নাইট্রোজেন। প্রকৃতিতে মুক্ত এবং যুক্ত—দু'রকম অবস্থাতে নাইট্রোজেনকে পাওয়া যায়। এর পরমাণুর ইলেকট্রনীয় গঠনে 'd' উপকক্ষ না থাকার জন্য নাইট্রোজেন জটিল যৌগ উৎপন্ন করতে পারে না। মুক্ত অবস্থায় বাতাসে আর যুক্ত অবস্থায় নাইট্রিক অ্যাসিডে, বিভিন্ন নাইট্রেট লবণে, অ্যামোনিয়া গ্যাসে, প্রোটিনে, ইউরিয়া ও কিছু কিছু জৈব যৌগে নাইট্রোজেনকে পাওয়া যায়। রসায়নের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে বায়ুমণ্ডলের উপাদান নিয়ে গবেষণাকালে নাইট্রোজেন আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবিষ্কারের বহু আগের যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে কিছু কিছু নাইট্রোজেনের যৌগ যথা, সল্টপিটার এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। নাইট্রোজেন এর আবিষ্কর্তা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ইংরেজ চিকিৎসক ডি. রাদারফোর্ড। 1772 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাদারফোর্ড তাঁর এক গবেষণাপত্রে নাইট্রোজেন এর বিভিন্ন ধর্মাবলী উল্লেখ করেন। তাতে তিনি লেখেন যে এই গ্যাসটি চুন অথবা ক্ষার দ্বারা শোষিত হয় না এবং প্রাণীর শ্বাসকার্যের অনুপযোগী। তিনি ঐ গ্যাসের নাম দেন 'Corrupted air' এরপর 'হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ' নাইট্রোজেনের ধর্মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করেন এবং গ্যাসটির নাম রাখেন 'অ্যাজোট' (azote) অর্থাৎ কিনা নিষ্প্রাণ বায়ু। 'নাইট্রোজেন' নামটি দেন বিজ্ঞানী চ্যাপট্যাল (Chaptal)।

পরীক্ষাগারে সোডিয়াম নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণকে সতর্কভাবে উত্তপ্ত করে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয় এবং গ্যাসটিকে জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। বেরিয়াম অ্যাজাইড [$Ba(N_3)_2$] নামক যৌগকে তাপ-বিয়োজিত করে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। শিল্পকাজে ব্যবহারের জন্যে, যে নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়, তা পাওয়া যায় তরলবায়ুর আংশিক পাতন দ্বারা।

'নাইট্রোজেন' বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন গ্যাস। নাইট্রোজেন এর পরমাণু দুটি ত্রিযোজী বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। এটি একটি সমযোজী যৌগ। এই গ্যাসটি দ্বিপরমাণুক। গ্যাসটি বাতাসের চেয়ে সামান্য হালকা এবং জলে কম দ্রাব্য। গ্যাসটি বিষাক্ত নয় এবং শ্বাসকার্যে সহায়তা করে না। নাইট্রোজেনের 'বহুরূপতা' ধর্ম নেই তবে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেনের দুটি স্থায়ী সমস্থানিক (আইসোটোপ) আছে। সে দুটি হলো N^{14} এবং N^{15} নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দ্বারা মৌলটির আরও কয়েকটি সমস্থানিক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে বটে, তবে তাদের অর্ধআয়ুষ্কাল খুবই কম। ঘরের উষ্ণতায় সাধারণ নাইট্রোজেন খুবই নিষ্ক্রিয় কিন্তু অধিক উষ্ণতায় এই মৌলটি ধাতব ও অধাতব মৌল এবং কিছু কিছু যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে 550°C উষ্ণতায়, 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এবং লৌহচূর্ণ অনুঘটকের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে। লোহিত অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম এবং নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড নামক যৌগ গঠন করে। আবার 1000°C উষ্ণতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড যৌগের সঙ্গে নাইট্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটায় উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড।

নাইট্রোজেন উদ্ভিদজগতের পক্ষে একটি অপরিহার্য মৌল। বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্যে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োজন। শিম ও ছোলা জাতীয় উদ্ভিদ বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক বন্ধন ঘটায়।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। ঐ বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে বাতাসের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে প্রথমে উৎপন্ন করে নাইট্রিক অক্সাইড এবং পরে আরও অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রিক অক্সাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। সেই নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ও বৃষ্টির জলের সঙ্গেই মাটিতে ঝরে পড়ে। মাটিতে পড়ে সেই নাইট্রিক অ্যাসিড বিভিন্ন নাইট্রেট লবণ গঠন করে—যা উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। এমনিভাবে প্রতিদিন পৃথিবীর বুকে প্রায়

আড়াই লাখ টন নাইট্রিক অ্যাসিড প্রাকৃতিক উপায়ে এসে জমা হয়ে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াচ্ছে। কিন্তু এতেও নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োজন মিটছে না বলে মানুষ অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে বায়ুর নাইট্রোজেনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রস্তুত করছে [যথা হাবার পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া, বার্কল্যান্ড ও আইড পদ্ধতিতে হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড। তারপর অ্যামোনিয়া থেকে তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার, নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন নাইট্রেট সার।]

নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয় অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রোলিম [নাইট্রোলিম হলো ক্যালসিয়াম সায়ানাইড ও কার্বনের মিশ্রণ] ও নাইট্রোজেন ঘটিত বিভিন্ন সার প্রস্তুতিতে। রাসায়নাগারে জারণ রাখবার জন্যে নিষ্ক্রিয় আবরণ সৃষ্টি করতে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তরল নাইট্রোজেন শীতক (refriegeran) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস থার্মোমিটার প্রস্তুতিতে এবং বৈদ্যুতিক বাল্বেও নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন কয়েকরকম বিস্ফোরক দ্রব্য (যথা, ট্রাইনাইট্রে-টলুইন) প্রস্তুতিতেও এই মৌলটির ব্যবহার আছে।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত সপ্তম/অষ্টম গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার

অংশুমান কর

বাবা আজ হসপিটালে গেলেন হাটের 'এক্স-রে' করতে। ছোট্ট টুকাই এক্স-রে কি তা জানে না। আমাকে। এসে ধরলে, বলল, ' দাদা, এক্স-রে কিরে ?' বললুম, ও তুমি বুঝবে না। টুকাই নাছোড় বন্দা ওকে শান্ত করার জন্যই বললুম 'এক্স-রে' হল একটা রশ্মি। যা দিয়ে শরীরের যে কোন অঙ্গের ফোটো তোলা যায়।' এটুকু বলেই ওকে চুপ করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ও বললে, 'আরো বল না দাদা।' কি বলব ? ভাবলুম 'এক্স-রে' আবিষ্কারের গল্পটাই বলি। ওকে বললুম, 'তুমি তো এক্স-রে আবিষ্কারের গল্পটা জানোনা, সেটাই বলি।'

বলতে লাগলুম, 'প্রথমে স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স নামে এক বিজ্ঞানী বিদ্যুত নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি একটা কাঁচের নলের বাতাস যতটা সম্ভব বার করে নিয়ে তার দুপাশে জুড়ে দিলেন দুটো তারের টুকরো। এদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুত চালালে তা নলের ভেতর দিয়ে বয়ে যেত। একদিন ক্রুক্স দেখলেন যে কাছের একটা ফোটোগ্রাফের প্লেট কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না তিনি।

এরপর 1895 খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর উজবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন অধ্যাপক ভিল হেলম্ কনরাড্ রণ্টজেন। তিনিও দেখলেন ঐ পরীক্ষার ফলে টেবিলের ড্রয়ারে রাখা প্লেটগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এরপর ঘটল আরো মজার কাণ্ড। রণ্টজেন একদিন ঐ প্লেট গুলো ডেভেলপ্ করতে গিয়ে দেখেন যে, তার একটার মধ্যে রয়েছে একটা চাবির ছবি। চাবিটা টেবিলের ওপর ছিল। তিনি তখন এই ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তিনি স্থির করলেন যে ঐ নল থেকে যে রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার জন্যই প্লেটগুলো ঝাপসা হচ্ছে এবং চাবির ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারেনি বলে চাবির ছবি প্লেটগুলোতে উঠেছে। তিনি তখন নলটাকে কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলেন। কিন্তু আগের মতই প্লেটগুলো ঝাপসা হতে লাগলো। রণ্টজেন তখন বুঝতে পারলেন যে নিশ্চয় এমন কোন আলো বা রশ্মি সৃষ্টি হচ্ছে যা চোখেও দেখা যায় না এবং যাকে কাগজ আটকাতে পারে না। রণ্টজেন ঐ রশ্মির নাম দিলেন 'এক্স-রে'। এটি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম আবিষ্কার। জানো টুকাই, এটা দিয়ে ভয়ঙ্কর ক্যান্সার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।' থামলুম আমি। টুকাই বললে, 'আমি যাচ্ছি দাদা'। বেরিয়ে গেল ও।

বেলিয়াতোড় উচ্চ বিদ্যালয়, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

ইলেকট্রনিকস্ ক্যুইজ—Part II-র উত্তর

1. (c), 2. (d), 3. (c), 4. (b), 5. (c), 6. (a), 7. (a), 8. (a), 9. (b), 10. (c), 11. (c), 12. (c)

জানুয়ারী সংখ্যার ইলেকট্রনিকস ক্যুইজের সংশোধনী

2. (d), 4. (c), 6. (d), 7. (c), 8. (b), 9. (c), 12. (b)

ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক
প্রত্যেকেই আজ ইংরাজী পাঠ্যক্রম নিয়ে চিন্তিত
ঠিক কিনা ?

কিন্তু কেন ? VI, VII, VIII, IX এবং X-এ ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী পড়ছে ঠিকই কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়েই সব গোলমাল। এর একমাত্র কারণ প্রশ্নপত্রের ধরন সম্পর্কে কেউই আদৌ ওয়াকিবহাল নন। প্রশ্ন কি রকম হতে পারে বা তার উত্তরটা যথাযথ কি হবে তার স্বচ্ছ ধারণা কারুরই নেই।

সব সমস্যার সমাধানে

TEST YOURSELF

[Sample Question Papers with Answers in Desk-Work Form]

by **An OXFORD GRADUATE**

[For Classes VI, VII, VIII, IX and X Separately]

প্রতিটি বইতে 15 সেট প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র 5টি সেটের পূর্ণাঙ্গ উত্তর (প্রয়োজনীয় নোটসহ) করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিভাবে পরীক্ষায় উত্তর করতে হবে। বাকী 10টি সেট-এর উত্তর ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের করতে হবে—এবং সেটি বইয়ের ভিতরেই **Desk Work** হিসাবে।

• VI, VII, VIII, IX এবং X-এর বই পৃথক পৃথক খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে •

দাম মাত্র বারো টাকা

EDUCATIONAL ENTERPRISE

2 Ramnath Biswas Lane, Calcutta-9 Phone: 350549,353881
1/1 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73 Phone: 326165

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

মার্চ 88 VII-VIII

1. এটি কিসের ছবি ?

2. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা শেষ গান কোনটি ?

3. গ্রহ ও তারার মধ্যে কার আলো স্থির ?

4. কোন্ তরল ধাতু লোহার চেয়েও ভারী ?

5. ইতিহাসে 'কর্ভি' বলতে কি বোঝায় ?

6. কোনটি ঠিক ? "ভারত বিশ্বের (a) প্রথম (b) দ্বিতীয় (c) সপ্তম বৃহত্তম দেশ।"

7. ইউরোপের বৃহত্তম নদীটির নাম কি ?

8. দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম কি ?

9. বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কি ?

10. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কে প্রথম 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেছিলেন ?

গ্রেড II

মার্চ' 88 IX-X

1. এক আলোকবর্ষ = কতো মিটার

2. মাছ ধরার ছিপে আলম্ব বিন্দুটি কোথায় থাকে ?

3. জুল ও আর্গের মধ্যে সম্পর্ক কি ?

4. মিটারের 10^{-9} ভাগকে কি বলা হয় ?

5. এটি কিসের বা কোন্ কর-পোরেশন-এর প্রতীক ?

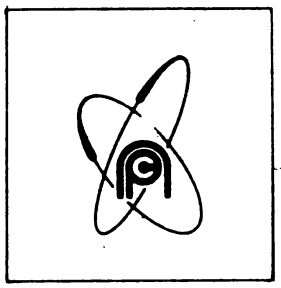

6. ভারতের উপরাষ্ট্রপতির বয়স কমপক্ষে কতো হওয়া প্রয়োজন ?

7. শেরশাহ প্রবর্তিত পাট্টাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ থাকতো ?

8. প্রতিহার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন ?

9. সাঁতারে কোন্ ভারতীয় মহিলা প্রথম পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেন ?

10. ভূটানের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম কি ?

গ্রেড III

মার্চ 88 XI-XII

1. নিচের ছবিগুলির পরিচয় দাও ?

2. কম্পিউটার বিজ্ঞানে C.A D বলতে কি বোঝায় ?

3. মানবজাতির মানসিক ও দৈহিক গঠন পাঠন বিষয়ক বিদ্যার নাম কি ?

4. প্রথম আবহাওয়া নির্ণয়ক কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কি ?

5. এশিয়ার বৃহত্তম টেলিস্কোপটি কোথায় অবস্থিত ?

6. TEFLON এর পুরো নামটি কি ?

7. রক্তের BH মান কতো ?

8. "We often find that the study of some natural phenomenon has been the starting point in the development of a new branch of knowledge."

নোবেল পুরস্কার লাভের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে কোন্ পদার্থ বিজ্ঞানী এই কথাগুলি বলেছিলেন ?

9. কোন্ আমেরিকান বিজ্ঞানী প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ?

10. স্যার আইজ্যাক নিউটন কতো সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক পদে বৃত হন ?

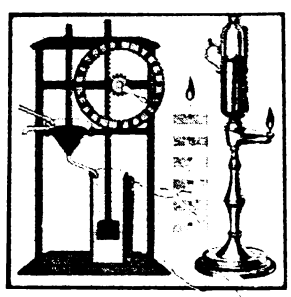

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

আকাশ থেকে লাফ

বিপদে পড়লে যেমন অনেক সময় বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি আমরা তেমনি আবার বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে অনেক সময় নতুন বুদ্ধির উদয় হয়। লোকে কিন্তু বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সে যাই হোক চুরির দায়ে কিনা জানি না ফরাসী এক যুবক জেল খাটছিল হাঙ্গেরীতে। ছেলেটির নাম আন্দ্রে জ্যাক্স গার্নারিন। ঘটনাটা দু'শ বছর আগের। তা ছেলেটি জেল থেকে পালানোর নানান স্বপ্ন দেখতো, নানা ফন্দি খেলতো তার মাথায়। জেলখানাটি ছিল বোধ হয় পাহাড়ী কোন উঁচু জায়গায়। তাই ছেলেটি ভাবত এমন কিছু যদি সে বানাতে পারতো যার সাহায্যে অনেক উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেও গায়ে আঘাত লাগবে না ত সে পালাতে পারতো। কিন্তু সে তা পারেনি। তবে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেও তার মাথা থেকে ওটা যায়নি।

1797 সাল। ততদিনে আকাশে বেলুন ওড়ানো শুরু হয়ে গেছে। গার্নারিন প্রথম প্যারাসুট বানিয়ে আকাশ থেকে লাফালো। একটা হাইড্রোজেন বেলুনের সঙ্গে ঝুড়ি বেঁধে উড়তে লাগলো আকাশে। বেলুন যখন হাজার খানেক মিটার উপরে তখন দড়ি কেটে গোটানো প্যারাসুট নিয়ে লাফালো গার্নারিন। ভাগ্য ভাল সময়মত প্যারাসুট খুলেছিল হাওয়ায়। নিরাপদে মাটিতে নেমেছিল সে। বয়স তখন তার সাতাশ বছর।

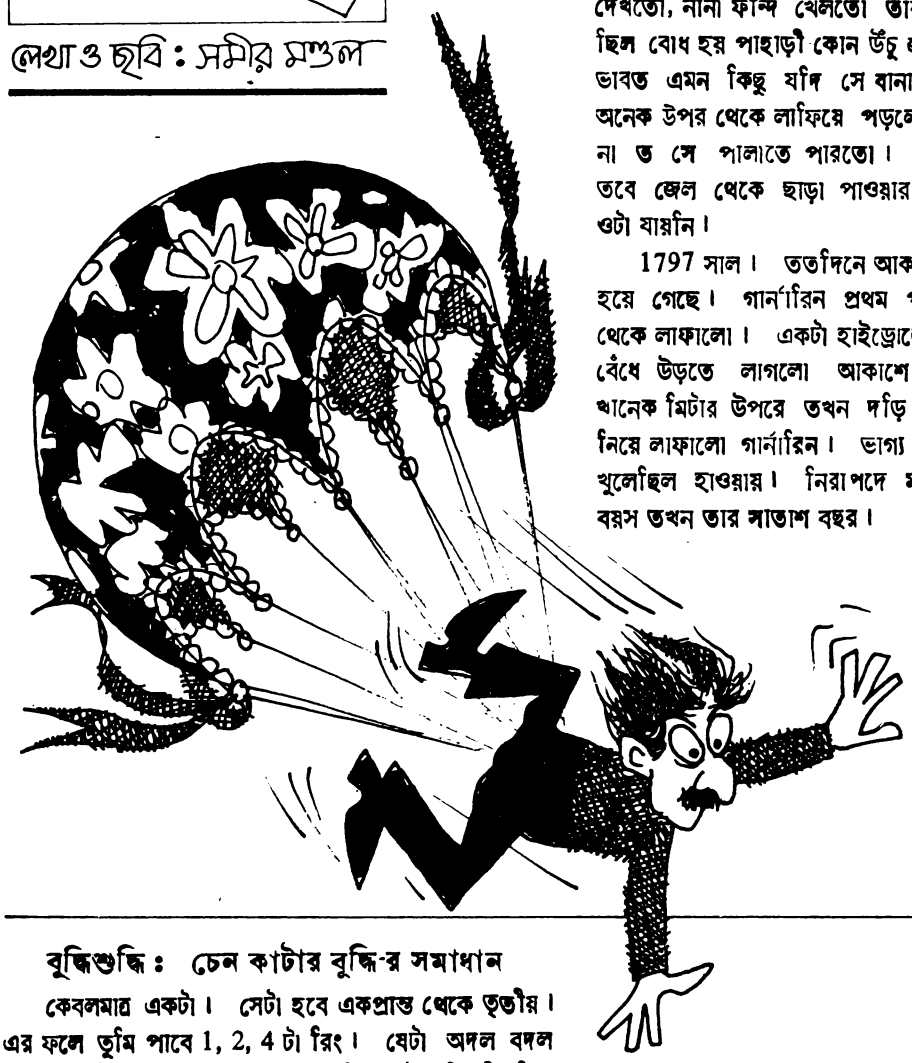

বুদ্ধিশুদ্ধি : চেন কাটার বুদ্ধি-র সমাধান

কেবলমাত্র একটা। সেটা হবে একপ্রান্ত থেকে তৃতীয়। এর ফলে তুমি পাবে 1, 2, 4 টা রিং। যেটা অদল বদল করে সাতদিন দেওয়া চলবে। প্রথম দিন 1টা। দ্বিতীয় দিন দুটো জোড়া রিং দিয়ে প্রথম দিনেরটা ফেরৎ। তৃতীয় দিন আগের ঐ একটা। চতুর্থ দিনে চারটে জোড়া রিং দিয়ে আগেরগুলো ফেরৎ এইভাবে।

নড়া চড়া ছবি

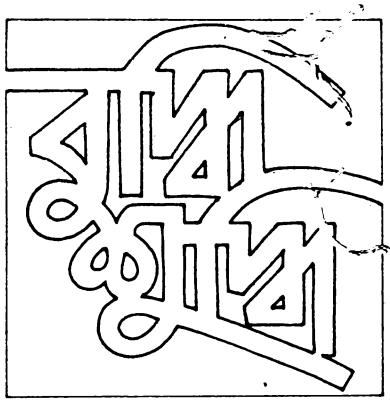

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

একটা মজার জিনিস শেখাব। নিজেরা তা করবে আর বন্ধুদের চমকে দেবে। দুটো কাগজ (পাতলা অথচ শক্ত) কাটো একই সাইজে। সাইজ : 10 সেমি. × 4 সেমি. একটার ওপর একটা সমান করে মিলিয়ে বসাও। ওপরের কাগজে পেন্সিলে (জোরে চেপে) একটা মুখ আঁকো। নিচের কাগজে হুবহু ছাপ পড়বে। কালি দিয়ে দুটো মুখই পরিষ্কার করে আঁকো এবার। শুধু একটা ছবিতে খোলা চোখ অন্যটাতে বন্ধ করে দাও। মুখটাও একটাতে খোলা অন্যটাতে হা করা যেতে পারে।

ওপরের ছবিটা পেন্সিলের গায়ে জড়িয়ে রোল করো। দেখবে কাগজটা খুললে আবার গুটিয়ে গোল হয়ে যাচ্ছে। এবার সমান ছবিটার ওপর গোটানো ছবিটা রেখে নিচের দিকে আঙ্গুলে চেপে ধরো। আড়াআড়িভাবে পেন্সিল চালিয়ে কাগজটাকে সোজা করো এমন ভাবে যাতে ওপরের দিকে পেন্সিল চালিয়ে কাগজ থেকে বেরিয়ে যায়। এতে করে গোটানো কাগজ আবার গুটিয়ে নিচের দিকে চলে আসবে। এইভাবে দ্রুত করো আর ছবির মুখটার দিকে লক্ষ্য রাখো। দেখবে তোমার সামনেই তোমারই আঁকা মুখ কেমন ভেংচি কাটে।

কেন এমন হয়? এর বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিটা পরের সংখ্যায়।

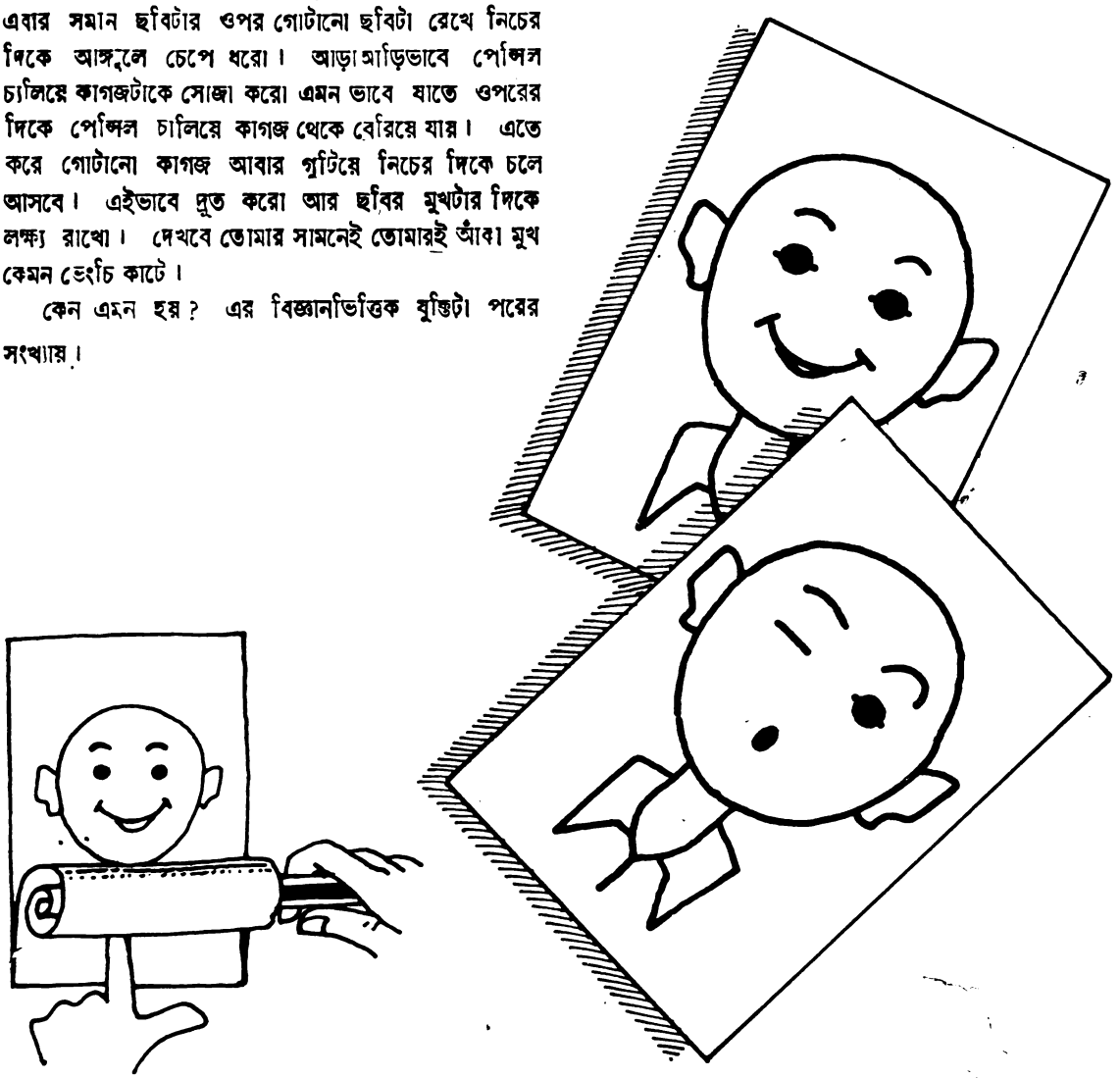

শ্রীদাম সরকার মার্চ '88

পাশাপাশি

1. স্ত্রীযৌন জনন একক। 2. 2, 4-D হরমোন দিয়ে যা দমন করা হয়। 5. সালোকসংশ্লেষ কালে উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে যে কণা গ্রহণ করে। 7. ময়ূরের ডাক। 8. একটি বাদ্যযন্ত্র। 10. কোন বস্তুর নির্দিষ্ট সময় ও দিক নিয়ে স্থান পরিবর্তনকে যা বলা হয়। 13. যার সংকেত Nacl। 14. তেজস্ক্রিয়তার একক।

উপর নিচ

1. রোধের ব্যবহারিক একক। 3. একটি গৃহপালিত পশু। 4. সমুদ্রে দূরত্ব মাপার একক। 5. উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একটি সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হলে প্রতিসরণের ফলে যে বিন্দুর সৃষ্টি হয়। 6. প্রবীণ-এর বিপরীতার্থক শব্দ। 9. একটি সংকর ধাতু। 12. তাপের একক। 11. শক্তির উৎস।

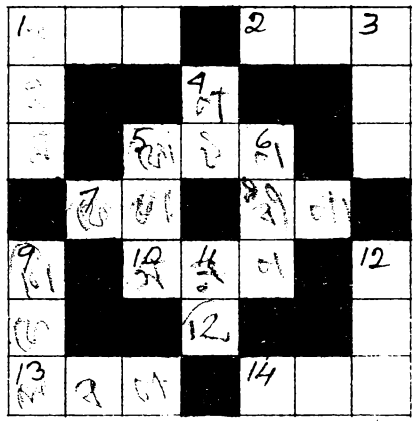

আই কিউ টেস্ট মার্চ '88

1. এমন একটি চার অক্ষরের ইংরাজি শব্দ বলো যার প্রথম অক্ষরটি উঠিয়ে নিলে খাওয়া বোঝায়, দ্বিতীয় অক্ষরটি তুলে নিলে বসবার জন্য নির্দিষ্ট কোন বস্তু বোঝায়, আর তৃতীয় অক্ষরটি উঠিয়ে নিলে সাক্ষাত করা বোঝায়। MEAT

2. এক অণু K_2SO_4কে জলে দ্রবীভূত করলে কতো সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন—

(a) 2, (b) 3, (c) 4

3. নিচের রাশিগুলির মধ্যে কোনটি ভেক্টর রাশি নয়—

(a) সরণ, (b) বল, (c) কৌণিক ভরবেগ, (d) চাপ

4. এদের মধ্যে কোনটি দলছাড়া—

আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, জল, শব্দ

5. শূন্যস্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে -

18 29 30 58

39 50 60 ?

জানুয়ারি '88 গ্রেড-1

1. কনস্টান্টিনোপল। 2. পর্বতের পাদদেশের আর্দ্রভূমি। 3. 1910 খ্রীস্টাব্দে। 4. কমে। 5. 1.68 মিটার চওড়া। 6. টিটিকাকা ; দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। 7. বিশ্বামিত্র মুনি। 8. আরোহী মূল। 9. ডেক্রন। 10. প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ।

জানুয়ারি '88 গ্রেড-2

1. 65 বছর বয়স পর্যন্ত। 2. ইংলণ্ডের শেফিল্ড ক্লাব। 3. রোধাঙ্কের একক। 4. ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। 5. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। 6. 'ব্যাবিলন' শহরে। 7. হাইড্রোজেন। 8. আর্যভট্ট। 9. মহারাজা সওয়াই জয় সিং, 1743 খ্রীস্টাব্দে। 10. 2 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড।

জানুয়ারি '88 গ্রেড-3.

1. 3·5 থেকে 8·5 kg/cm^2 চাপে। 2. High Pressure Liquid Chromatography. 3. ফেব্রুয়ারী 29, 1928 খ্রীস্টাব্দে। 4. ডেঙ্গু জ্বর। 5. পটাসিয়াম কার্বনেট। 6. Tocopherol. 7. লর্ড ময়রা। 8. 1848 খ্রীস্টাব্দে। 9. Collagen. 10. Spined Soldier bug.

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই কিউ টেস্ট জানুয়ারী '88-এর সমাধান

1. 3টি 2. হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড

3. (d) ভরবেগ। কারণ ভরবেগের একক c.g.s.

$$= gm \times \frac{cm}{sec} = \frac{gm \times cm}{sec^2} sec = dyne \times sec$$

4. হাইড্রোজেন বাদে বাকী সব কটি গ্যাস নিষ্ক্রিয়।

5. 17. পূর্ববর্তী সংখ্যাকে দু'গুণ করে তার সঙ্গে 1 যোগ করে।

শব্দকূট সমাধান

ফেব্রুয়ারী '88

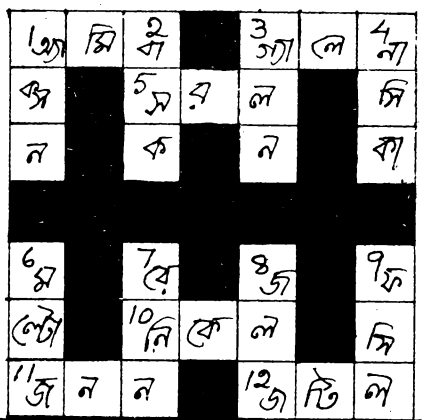

খেলাঘরের পাখা

অপরাজিত বসু

বিনা ইলেকট্রিকে কি পাখা ঘোরানো যায়? যায়। একটা গোল ফ্লাস্কে জল ভর্তি কর, অবশ্য কানায় কানায় নয়, মাঝে যেন কিছুটা ফাঁকা থাকে। ফ্লাস্কের মুখে রবারকর্ক আটকে তার মধ্য দিয়ে একটা কাচের নল ঢুকিয়ে দাও। কাচের নলের মধ্যে এবার পলিথিনের টিউব ঢোকাও। পলিথিনের টিউবটা যেন খুব এঁটে না বসে দেখতে হবে, আবার ঢলঢলে হলেও চলবে না।

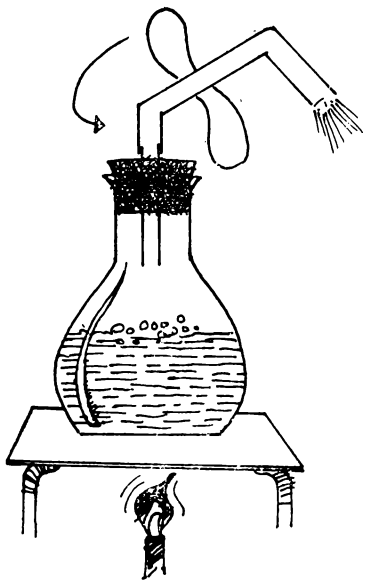

পলিথিনের টিউবটা দু'বার সমকোণে বাঁকাতে হবে, টিউবের মুক্ত প্রান্তটা যেন ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয় তা দেখতে হবে। পাতলা টিনের দু'টো ছোট্ট বাঁকানো পাতকে পলি-টিউবের মাঝে অ্যারালডাইট দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। টিনের পাত-দু'টিকে এমনভাবে বাঁকাতে হবে যেন তা হাওয়া কাটতে পারে, সাধারণ বিদ্যুৎ-পাখার ব্লেডের মতো।

এবার ফ্লাস্ককে তারজালির উপর বসিয়ে নিচ থেকে তাপ দাও। জল ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত বাষ্প কাচের নল দিয়ে এসে পলি-টিউবের প্রান্ত থেকে জোরের সঙ্গে বেরোতে থাকবে। যেই জোরে বাষ্প বের হবে অমনি পলি-টিউবটা ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে ঘুরতে থাকবে—সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে দু'টি টিনের পাত—যা তোমার দিকে হাওয়া পাঠাবে নিশ্চিত!

কেন পলি-টিউবটা ঘুরছে? স্যার নিউটনের তৃতীয় সূত্রের প্রয়োগ। বাষ্প জোরে বের হবার সময় তার প্রতিক্রিয়ায় পলি-টিউবটা কাচের নলের চারপাশে ঘুরবে—যা আবার টিনের পাতের ঘূর্ণনের জন্য দায়ী। রকেট বা হাউইবাজি যে প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয় ঠিক সেভাবেই তোমার খেলাঘরের পাখা বিনা বিদ্যুতে ঘুরছে। এবার আর কি, নিজেরাই ভাই-বোনদের খেলাঘরে পাখা ঘুরিয়ে দাও।

৪, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলি-৪৭

ব্লিচিং পাউডার থেকে ইলেকট্রিসিটি

প্রদীপ কুমার করণ

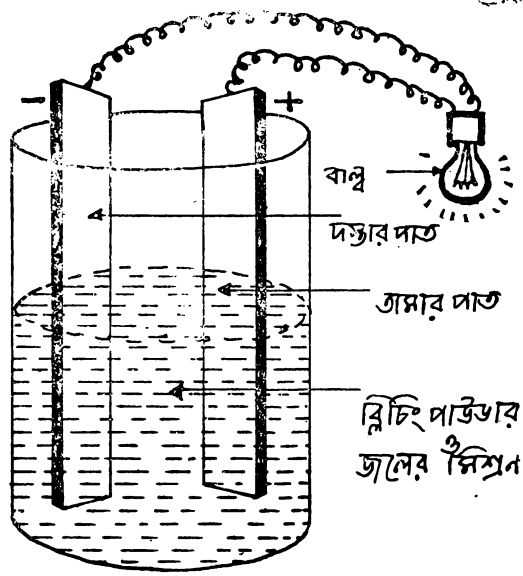

এই মডেলটি তৈরি করা খুব সহজ এবং খরচও পড়ে খুব কম। ব্লিচিং পাউডার থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হবে খুব আশ্চার্য নয় কি?

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যোগাড় করে ফেল

(1) একটি বড় কাঁচের বীকার। (2) একটি তামার পাত। (3) একটি দস্তার পাত। (4) ব্লিচিং পাউডার। (5) কয়েক গজ তার। (6) জল। (7) একটি বাল্ব।

এইবার প্রস্তুতি শুরু করা যাক। বীকারটিতে অর্ধেকের একটু বেশি জল নাও। সেই জলে কিছুটা ব্লিচিং পাউডার (শুষ্ক) ভালো করে মিশিয়ে নাও। এইবার বীকারের দুই ধারে একটা তামার পাত ও একটা দস্তার পাত ঢুকিয়ে দাও। এইবার দুটি তামার তার নিয়ে একটি বাল্ব-এর সঙ্গে তামার পাতের এবং একটি বাল্ব-এর সঙ্গে দস্তার পাতের সংযোগ ঘটাও। এখন দেখবে যে বাল্বটি জ্বলছে।

যখন দেখবে যে বাল্বটি নিভে গেছে তখন ব্লিচিং পাউডার ও জলের মিশ্রণটি পাল্টে দেবে।

বিঃ দ্রঃ এই মডেলটিতে ইলেকট্রিক বাল্ব নিবে না, এখানে টর্চে যে বাল্ব থাকে সেইটি নিবে।

গ্রাম—উত্তর রায়পুর, পোঃ—দক্ষিণরায়পুর, দক্ষিণ 24-পরগনা।

মডেল বানাতে গিয়ে

রাজেশ গিরি

ট্রানজিস্টরকে মোটামুটি দুটো ডায়োডের মিলনে গঠিত একটি যন্ত্রাংশ বলা যেতে পারে। তাই ডায়োড দুটোর সংযোগস্থল ও অপর দুটো পিন, (১নং ছবি) মোট তিনটে পিন হল সাধারণ ট্রানজিস্টারের

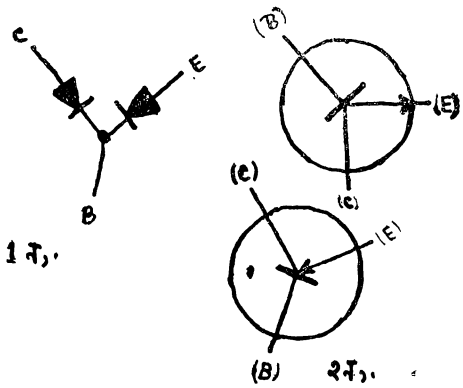

১নং

২নং

বেস (B), কালেকটর (C) ও এমিটর (E)। আমরা মডেল বানাতে গিয়ে ট্রানজিস্টরকে সার্কিট বোর্ডে লাগাতে গিয়েই অসুবিধায় পড়ি। যেমন, সার্কিট ডায়াগ্রামে অনেক সময় ট্রানজিস্টর-এর চিহ্নে B, C, E চিহ্নিত করা থাকে না (2নং ছবি), তখন ঐ চিহ্ন দেখেই তার কোনটা E, B ও C তা চিনে নিতে হয়। কিন্তু নব্য ইলেকট্রনিক্স প্রেমীরা অভিজ্ঞতার অভাবে তখন অসুবিধায় পড়ে। এসব ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টর-এর চিহ্নে E, B ও C কোনটা হবে তা ছবি দেখে বুঝতে হবে। ট্রানজিস্টর-এর তিনটে তারের মধ্যে কোনটা E, B ও কোনটা C তা নির্ণয় করতে না পেরে সার্কিট বোর্ডে ভুল লাগিয়ে ফেলায় মডেল কাজ করে না। ট্রানজিস্টর-এর E, B ও C চেনার উপায়ঃ—সাধারণতঃ ট্রানজিস্টরের তিনটে পিনের উৎপত্তি স্থলকে কাল্পনিক তিনটে রেখা দিয়ে যোগ করলে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় তার তিনটে শীর্ষবিন্দুর মধ্যে যেটা অপর দুটো থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থিত সেটা হবে ঐ ট্রানজিস্টারের বেস (B), এবার ট্রানজিস্টরকে উল্টে অর্থাৎ পিনগুলো উপরদিকে করে ধরে B-কে নিজের শরীরের দিকে রাখলে বাঁদিকের পিনটা হবে C ও ডানদিকের তারটা হবে E। ট্রানজিস্টর বিভিন্ন প্যাকেজে তৈরি হয় তাই বিভিন্ন প্যাকেজে E, B, C-এর অবস্থান বিভিন্ন হয়। ইনভার্টার যন্ত্রে ব্যবহৃত 2N 3055 ট্রানজিস্টারে দুটো পিন আছে যারা B ও E এর C হল এর ধাতব শরীর।

ঘোরা ধরা – ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর—721507

AWON MATHEMATICAL
EQUIPMENTS CORPORATION
4, BARUIPARA LANE, CALCUTTA-700 035

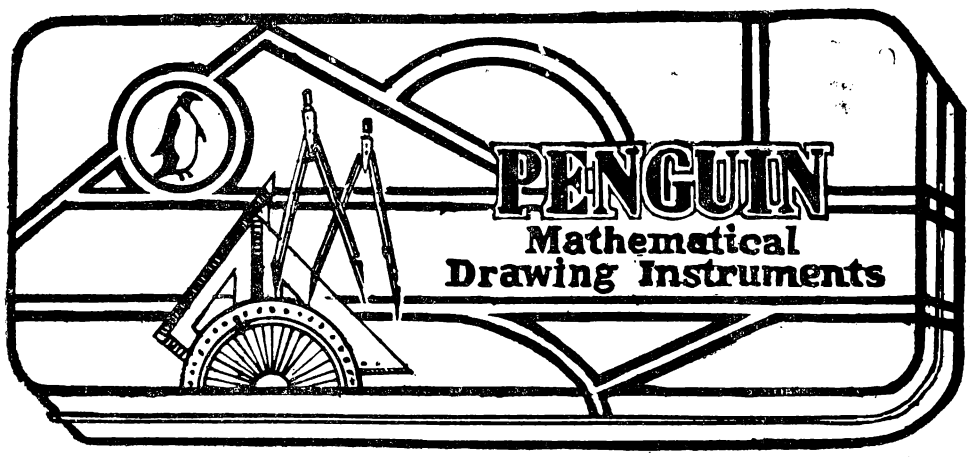

(**Manufacturer of Drawing Instruments**)
For better accuracy draw with Penguin Brand Instrument box and secure highest marks

বলতে পারো কেন ? সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

বজ্র কি এবং কিভাবে আকাশ থেকে ছুটে আসে ?

আরও জানতে চেয়েছো লক্ষ্মীকান্ত বসু, গোবরা—চণ্ডীতলা—হুগলী থেকে

আকাশে মেঘ করলেই বজ্রপাত হয়ে থাকে। মেঘ আবার গঠিত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমন্বয়ে। যেহেতু মেঘের জলকণাগুলো অনবরত এক ভাঙ্গাগড়া প্রণালীর মাধ্যমে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ কখনও কতকগুলো ছোট ছোট কণা মিলে বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয় আবার কখনও বড় বিন্দুগুলো ভেঙ্গে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। মেঘগুলো বিদ্যুৎ কণিকার দ্বারা পূর্ণ হওয়ার জন্য ঐ ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে সম্ভবত তড়িতাধানের পৃথকীকরণ হয়। এর ফলে কোন মেঘ পজিটিভ বিদ্যুৎ কণায় এবং কোন মেঘ নেগেটিভ বিদ্যুৎকণায় পরিপূর্ণ। অপরদিকে একই মেঘে উপরের অংশটা হয়ত পজিটিভ এবং নিচের অংশটা নেগেটিভও হতে পারে। হাওয়ায় চালিত হয়ে পরস্পর বিপরীত ধর্মী বিদ্যুৎ কণা বিশিষ্ট দুটি মেঘ কাছাকাছি হলে বিদ্যুৎ কণাগুলো পরস্পর মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে অথবা একই মেঘে দু ধরনের বিদ্যুৎ কণা উৎপন্ন হলেও মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। আর মিলিত হওয়া মাত্রই এমন বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটে যে তাতে আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায় এবং প্রচণ্ড শব্দও একটু পরে শুনতে পাওয়া যায়। ওকেই আমরা বজ্রপাত বলি।

বজ্রকে চলতি কথায় বাজ বলা হয়। এটি তাই কোন শক্ত ফলা বা ছুঁচলো জিনিস নয়। বেছে বেছে কোন গাছ বা বাড়ির উপরও পড়ে না। মেঘের বিদ্যুৎ মেঘ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার সময় কোন উঁচু জিনিসের ভেতর দিয়ে গেলে সেটি পুড়ে যায় এবং ফেটেও যায়। বিদ্যুৎস্ফুরণ ক্ষণস্থায়ী ও এক সেকেণ্ডেরও হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে সংঘটিত হয়। এত অল্প সময়ে হলেও যে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ বাতাসের ভেতর দিয়ে চলাচল করে, তাতে সহসা বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ভয়ানক ভাবে প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং পরক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে আসে। এতে বায়ুস্তরগুলিতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগায় সুতীব্র আওয়াজও হয়।

এ মাসের প্রশ্ন

টিকটিকির লেজ খসে যায় কেন এবং এরা সোজা দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে কেমন করে ?

জানতে চেয়েছো (1) শ্যামল সেন ও সীমা চক্রবর্তী, ইন্দা—খড়্গপুর, মেদিনীপুর এবং (2) সোমনাথ বট্‌ব্যাল, বাবুডুমরো হাইস্কুল—কর্তিয়া-মেদিনীপুর থেকে। তোমাদের আর একটি প্রশ্ন কোয়াসারের কথা মাত্র স্বল্প কয়েক মাস আগে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রঃ ডাক্তাররা ব্যবস্থাপত্রের প্রথমে $^{R}/$ লেখেন কেন ? দেবপ্রসাদ দত্ত, সুরধা-কুরুমগ্রাম—বীরভূম।

উঃ এটি একটি সাংকেতিক শব্দ। পুরো শব্দটি Receipi। এর বাংলা অর্থ 'এগুলি নিন'।

প্রঃ ব্রোমিন দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে কি কি জিনিস উৎপন্ন হয় ? প্রশান্তকুমার ভৌমিক ও অমর। গংগারামপুর নিউ মার্কেট, পশ্চিম দিনাজপুর।

উঃ জারিত হয়ে সালফার ও হাইড্রোক্লোমিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। [$H_2S+Br_2=S+2HBr$]

প্রঃ HCl তড়িৎযোজী না সমযোজী ? একটু ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। মিলি রায়। কীর্নাহার টি. পি. এম গার্লস স্কুল, বীরভূম।

উঃ প্রশ্নটির উত্তর দানের আগে তড়িৎ যোজ্যতা এবং সমযোজ্যতা কাকে বলে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করতে হয়।

তড়িৎ যোজ্যতা ঃ—যে সব ক্ষেত্রে দুটি পরমাণুর মিলনের সময় একটি পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন অপর পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয়, তথা একটি পরমাণু তার শেষ স্তর থেকে ইলেকট্রন দান করে ও অপর পরমাণু তাকে গ্রহণ করে, সে সব ক্ষেত্রে এই দেওয়া-নেওয়া এমনভাবে সম্পন্ন হয় যে উভয় পরমাণুই শেষ কক্ষে 8টি ইলেকট্রনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু কাঠামো বা সংবদ্ধ ইলেকট্রনীয় গঠন পেয়ে থাকে। অনুরূপ যোজ্যতাকে বলা হয় তড়িৎযোজ্যতা বা ইলেকট্রনীয় যোজ্যতা। আবার কখনও কখনও একে আয়নীয় যোজ্যতাও বলে। (কসেলের মতবাদ)

উদাহরণ স্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সোডিয়াম পরমাণুর সর্ব শেষ কক্ষে থাকে মাত্র একটি ইলেকট্রন এবং ক্লোরিন পরমাণুর একেবারে বাইরের কক্ষে থাকে সাতটি ইলেকট্রন। এমন ক্ষেত্রে

সোডিয়ামের মাত্র একটিকে বর্জন করা এবং ক্লোরিনের একটিকে গ্রহণ করাই সুবিধাজনক। [সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা 11। প্রথম কক্ষে 2, দ্বিতীয় কক্ষে 8 এবং তৃতীয় কক্ষে 1। এবং ক্লোরিনের ইলেকট্রন সংখ্যা 17। প্রথম কক্ষে 2, দ্বিতীয় কক্ষে 8 এবং তৃতীয় কক্ষে 7। গ্রহণ ও বর্জনের ফলে হয় 7 + 1 = 8টি]

সমযোজ্যতা :—এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে দুটি পরমাণু যখন সংযোজিত হয় তখন প্রত্যেকটি পরমাণু থেকে একটি করে ইলেকট্রন এসে একটি ইলেকট্রন যুগল গঠন করে এবং এই ইলেকট্রন যুগলকে প্রত্যেক পরমাণুই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। ফলে উভয় পরমাণুর বাইরের কক্ষ 8টি ইলেকট্রনের দ্বারা সম্পৃক্ত করে নেয়। অনুরূপ উপায়ে দুটি পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পায় এবং পরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বা পরমাণুর বিদ্যুৎমাত্রার কোন তারতম্য ঘটে না। একেই বলা হয় সমযোজ্যতা। (লুই-এর মতবাদ)। ঐ ইলেকট্রনদ্বয়কে পরমাণুদের মিলনসেতু বা বন্ধনী বলা যেতে পারে।

HCl সমযোজী যৌগ। কারণ, হাইড্রোজেন বাইরের কক্ষের একটিকে এবং ক্লোরিনের বাহিরের কক্ষের সাতটি থেকে একটি দিয়ে মোট দুটি ইলেকট্রনের একটি ইলেকট্রন যুগল গঠন করে। এতে হাইড্রোজেন বাইরের যুগলটি ব্যবহারের জন্য যেমন সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে তেমনই ক্লোরিন তার অবশিষ্ট 6টি ও যুগল নিয়ে মোট আটটি ইলেকট্রনের চাহিদা মেটায়।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, অনেক যৌগের মধ্যে সমযোজ্যতা এবং তড়িৎ যোজ্যতা উভয় চরিত্রের যুগপৎ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যে যৌগের মধ্যে সমযোজ্যতার ধর্মের প্রাধান্য বেশি তাকে আমরা সমযোজী বলি এবং তড়িৎ যোজ্যতার প্রাধান্য থাকলে বলি তড়িৎযোগী। আরও দেখা গেছে, দ্রাবকের প্রভাবে অনেক সময় যৌগের সমযোজ্যতা হ্রাস পেয়ে তড়িৎ যোজ্যতার প্রকৃতি বৃদ্ধি পায় এবং এর বিপরীতও হয়। HCl এই জাতীয়। এটি সমযোজী যৌগ হলে কি হয়, এর জলীয় দ্রবণে অণুগুলো আয়নিত হয়ে যায় বলে জলীয় দ্রবণে তড়িৎ যোজ্যতার চরিত্র প্রকাশ পায়।

প্রঃ সূর্যের তেজ ফুরোতে এখনও কত বছর বাকি? অশ্রু মণ্ডল, হাঁসখালি-নদীয়া।

উঃ সূর্যকে এখনও বয়সে তরুণ বলা যায়। তার জন্মের সময় থেকে প্রায় 500 কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই হারে সে আরও 500 কোটি বছর তাপ বিতরণ করে চলবে। তারপরেই তার দেহে নামবে জরা। আর জরা নামলেই সূর্য দেহে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে সূর্য টিকে থাকবে আরও অন্ততঃ হাজার কোটি বছর।

প্রঃ মানুষের গায়ের রঙের ভিন্নতা দেখা যায় কেন? অমলেন্দুকুমার ভুঞ্যা, রেয়েপাড়া—মেদিনীপুর।

উঃ নিশ্চয়ই জানতে চেয়েছো, মানুষের গায়ের রঙ ফর্সা বা কালো হয় কেন? এর উত্তরে বলতে হয় যে, আমাদের চামড়ার অন্তঃস্থকে থাকে এক ধরনের রঞ্জন কলা। ঐ কলা থেকে নিঃসৃত এক ধরনের কালো রঞ্জক পদার্থ সূর্যের ইনফ্রায়েড রশ্মি প্রভৃতি কতকগুলো ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষার জন্য দেহের চামড়ার বাইরের দিকে একটি আস্তরণের সৃষ্টি করে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এই অঞ্চলে ক্ষতিকর রশ্মিগুলির প্রভাব অধিক। তাই রঞ্জক পদার্থটির অধিক নিঃসরণ ঘটে বলে উক্ত অঞ্চলের মানুষের গায়ের রঙ কালো। অপর দিকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ও শীতপ্রধান অঞ্চলে ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব কম হওয়ায় রঞ্জক পদার্থটির বেশি নিঃসরণ ঘটার প্রয়োজন হয় না। তাই এইসব অঞ্চলের মানুষের গায়ের রঙ ফর্সা। তবে মনে রাখতে হবে, গায়ের রঙের ক্ষেত্রে বংশধারাও অনেকাংশে দায়ী।

প্রঃ ফাইবার গ্লাস কি কি জিনিস দিয়ে তৈরি হয়? মণীন্দ্রকুমার জানা। খালোড়—বাগনান—হাওড়া।

ফাইবার গ্লাস অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাচের তন্তু ছাড়া কিছু নয়। এমন সূক্ষ্ম যে, ঐ তন্তুর ব্যাস মাত্র এক মাইক্রোমিটারের চার ভাগের এক ভাগ।

প্রঃ দাঁতে পোকা হয় কেন? রতনচন্দ্র ঘোষ। কেশবপুর—হুগলী।

উঃ চলতি কথায় দাঁতে পোকা ধরার কথা বলা হলেও, দাঁতে পোকার আক্রমণ হয় না। আসলে দাঁতের ক্ষয়কেই আমরা সচরাচর পোকা ধরা বলি।

দাঁতের ক্ষয় হয় যদি দাঁতের গোড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা লেগে থেকে যায়। বিশেষতঃ রাতে দাঁতের কোন কাজ থাকে না। তখন মুখ থেকে যে লালারস নিঃসৃত হয় তাও স্থির অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে অম্লযুক্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে দাঁতের গোড়ায় এবং লালাতে এক ধরনের অণুবীক্ষণিক জীবাণুরাও বাস করে। যদি দাঁতের গোড়ায় খাদ্যকণা লেগে থাকে তাহলে সেই অম্লযুক্ত পরিবেশে জীবাণুদের ক্রিয়ায় তৈরি করে ল্যাকটিক অ্যাসিড নামে একটি অম্ল। ঐ অম্লই দাঁতের ক্ষয় করে।

প্রতি বারে খাওয়ার পরে দাঁত ব্রাস করলে, অন্ততঃ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে একবার ব্রাস করে নিলে দাঁতের ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে না। বিস্কুট ও চকোলেট খেলে দাঁতের গোড়ায় কিছু না কিছু লেগে থাকেই। অতএব এগুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাস করা উচিত।

পোঃ কালিন্দী, মেদিনীপুর।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কয়েক বছর পরে আবার এবারে কলিকাতা পুস্তকমেলায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ষ্টল হয়েছিল। সেখানে গত 2/3 বছরের পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া বাংলায় অন্যান্য পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থও প্রদর্শিত হয়েছে। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানেয় পাঠক পাঠিকা ও বিজ্ঞানুরাগী দর্শকের প্রচুর সমাগম হয়। জানুয়ারী 88 সংখ্যা থেকে তিনটি নতুন ধারাবাহিক রচনা শুরু হয়েছে দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস, অদ্রীশ বর্ধনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে আর সৌম্য মিত্রের কমপিউটারের কলা-কৌশল। আশা করি রচনা তিনটি তোমাদের ভালো লাগবে।

পরিচালক
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জানুয়ারী '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার পাবে ঃ

1. সঞ্জয় দে, জীতেন্দ্রনাথ দে, মাটিখান, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

2. পার্থ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া, কুণ্ডুগলি, পোস্ট—বাঁশবেড়িয়া, জেলা—হুগলী, পিন-712502।

জানুয়ারি '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যারা পুরস্কার পাবে ঃ

1. গৌতম দে, 17/8, রাজা রাজকিষণ স্ট্রীট, কলকাতা-700 006

2. মহুয়া ঘোষ, প্রযত্নে, পি. এস. ঘোষ, 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-700 054।

3. সিতাংশু ঘোষ, A_3—4/2, ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর-10, বর্ধমান।

জানুয়ারি 88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

24-পরগনা ঃ রুণু নিয়োগী, সৌমেন ভৌমিক, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, হাওড়া ঃ সৈকত বিশ্বাস। বর্ধমান ঃ অনির্বাণ গুহ। মেদিনীপুর ঃ শ্যামল সেন, অতীন্দ্রনাথ দাস। নদীয়া ঃ শুভজিৎ মাইতি।

জানুয়ারি '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এবং আই-কিউ-টেস্ট এর উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোন নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

বিঃ দ্রঃ জানুয়ারি '88-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর 5নং প্রশ্নে 21 এর স্থলে 31 এবং উত্তরে 17 নং এর স্থলে 63 পড়তে হবে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

ঘোষণা

আই কিউ টেস্ট, ক্যুইজ কনটেস্ট 1 2 3 এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের এপ্রিল/মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার অর্পণ করা হবে।

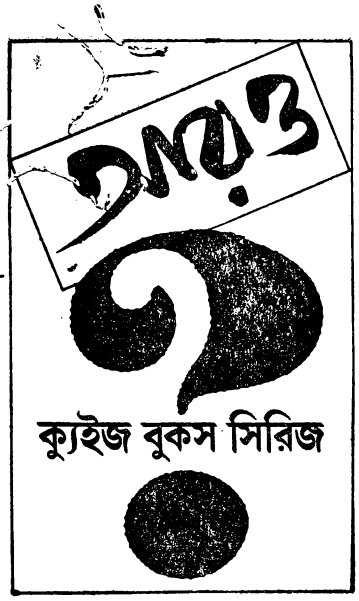

H.S. IIT, JEE NTS পরীক্ষার্থীদের
জন্য আরও ক্যুইজ বুকের সিরিজ

অমরনাথ রায়
আরও সায়েন্স ক্যুইজ

সমীরকুমার ঘোষ
আরও ফিজিক্স ক্যুইজ

রতন মোহন খাঁ
আরও গণিত ক্যুইজ

তারকমোন দাস ও
অসিতকুমার দাস
আরও বায়োলাজ ক্যুইজ

প্রতিটি দশ টাকা মাত্র

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে ক্যুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VI-VII VIII, IX-X ও XI-XII। ফটো ক্যুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না ;

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে ১০টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মার্চ ৪৪' সংখ্যার
ক্যুইজ কনটেস্টে উপহার
গ্রেড 1 সুধাংশু পাত্রের
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ
গ্রেড 2 দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
পৃথিবী পরিচয়
গ্রেড 3 অমরনাথ রায়ের
আরও সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স.....শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম.....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এ উত্তর পাঠালাম।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের
নিত্যসঙ্গী

Kanak

এলুমিনিয়াম
স্কুল বক্স ও
লাঞ্চ বক্স

UPCO-62A/82

প্রস্তুতকারকঃ

পি এল মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
কলিকাতা–৭০০ ০০৫

বিজ্ঞান সমাবেশ

বইমেলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

গত 27 জানুঃ থেকে 7 ফেব্রুঃ পর্যন্ত কলকাতার ময়দান কলিকাতা পুস্তকমেলা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রাজা রামান্না। রামান্না তাঁর ভাষণে বলেন, ছোটদের ও সকলের জন্যে আরও চিত্তাকর্ষক জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া দরকার।

গল্প, উপন্যাস, ধর্ম, কবিতা ও নানা রকম পুস্তকের ভীড়ে শুধুমাত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের বইয়ের আয়োজন করেছিলেন —বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, উৎস মানুষ ও কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা। এই তিনটি স্টলে প্রচুর সংখ্যক দর্শক সমাবেশ হয়। বিক্রীও হয় প্রচুর। 'উৎস মানুষের স্টলে 'এটা কি ওটা কেন?' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্টলে জয়ন্ত বসুর 'টোকাব্যাক' ও কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের স্টলে দিলীপ কুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'পৃথিবী পরিচয়' গ্রন্থটি সর্বাধিক বিক্রী হয়। এছাড়া অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রী হয়। দশম দিনে অর্থাৎ 5 ফেব্রুঃ শুক্রবার অপরাহ্নে মেলার কফি হাউসের স্টলে এক অলিখিত সমাবেশ ঘটে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানলেখকগণের এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পক্ষিবিজ্ঞানী অজয় হোম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য দিলীপ সিংহ, সমরজিৎ কর, অরূপরতন ভট্টাচার্য, পার্থসারথি চক্রবর্তী, বিমান বসু, জনাব শরবুদ্দীন, দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের সহ-সম্পাদক জয়ন্ত দত্ত সবাইকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।

বোরোলিন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি অনুষ্ঠান ছিল 'সাহিত্যিকদের মুখোমুখি'। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে—তথ্য পরিবেশনের যুগে—'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানলেখকদের মুখোমুখি'—এই শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান কি করা সম্ভব? কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স্মরণ-সভা

বিশ্ববাণী প্রকাশনীর প্রয়াত মালিক ও লিটল্ ম্যাগাজিনের অকৃত্রিম বন্ধু ব্রজকিশোর মণ্ডলের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল বইমেলার বোরোলীন অডিটোরিয়ামে গত 4ঠা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7 টায়। স্মৃতিচারণ করলেন যথাক্রমে শ্রীমতী রেখা ধর, শ্রীদেবকুমার বসু, শ্রীসন্দীপ দত্ত, শ্রীসিদ্ধার্থ দাস ও শ্রীসুশীল দে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মেলা

গত 7 থেকে 10ই ফেব্রুয়ারী '88 কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার যৌথ উদ্যোক্তা ছিল বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এবং নতুন দিল্লীর ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্ এডুকেসনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং (NCERT)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচীব শ্রী এন কৃষ্ণমূর্তি। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার অধিকর্তা শ্রীসমর বাগচী। শ্রীবিশ্বাস তাঁর ভাষণে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ক্লাব সাধারণ মানুষ ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। বিজ্ঞানের মজার বিষয়গুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য বিজ্ঞান সংগ্রহশাহার অধিকর্তা শ্রীবাগচীকে কেরালার মতন ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করতে অনুরোধ করেন। স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁর ভাষণে বাছাই করা মডেলগুলিকে পুরস্কৃত করার সাথে সাথে অন্যান্য মডেলগুলির প্রস্তুতকারীদের তাদের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে দুচার কথা বলেন। এবারের মেলায় 17টি জেলা থেকে প্রায় শতাধিক স্কুল ও বিজ্ঞান ক্লাবের দ্বিশতাধিক খুদে বিজ্ঞানী মডেল নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এ বছর মেলায় জল ও পরিবেশ দূষণ বিষয় দুটি অধিক প্রাধান্য পায়।

10ই ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ জে জে বোস। তিনিই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বিজ্ঞান মেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন বিজ্ঞান মেলা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি ও নতুন বিজ্ঞানী তৈরীর মত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। শ্রী বোস তার ভাষণে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থেকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীবাগচীও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হন। এ রাজ্য থেকে একচল্লিশটি নির্বাচিত মডেল 13 থেকে 17ই জানুয়ারী পাটনায় অনুষ্ঠিত পূর্বভারত বিজ্ঞান শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

দেবব্রত নাহা

জনবিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন যে কি বিপুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে তার সাম্প্রতিক প্রমাণ, বেথুয়াডহরীতে স্থাপিত হলো আরেকটি বিজ্ঞান ক্লাব, জনবিজ্ঞান পরিষদ। প্রসঙ্গতঃ বেথুয়াডহরী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বিজ্ঞান ক্লাবের অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। 10ই জানুয়ারী জনবিজ্ঞান পরিষদ আয়োজন করেছিল এই উপলক্ষ্যে আলোচনাচক্র, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী, স্লাইড শো, ভিডিও শো, কুসংস্কার সর্বনাশা নেশা, ওষুধ-সাপ ও জ্যোতিষ নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী। রাজ্যের অন্যতম বিজ্ঞান সংস্থা মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এই নবতম প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য। **পার্থ মুখোপাধ্যায়**

বিজ্ঞান অন্বেষা

বিজ্ঞান অন্বেষা (গুসকরা) ও AISTA (W.B) এর যৌথ উদ্যোগে গত 16 জানুয়ারী শনিবার গুসকরা পি. পি. ইন্সটিটিউশনে এক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'মানব জীবনে উদ্ভিদের প্রভাব' শীর্ষক আলোচনায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে মহঃ সিরাজউদ্দিন (গুসকরা বালক প্রাঃ বিঃ) এবং মণিদীপা কোঁয়ার (হাটকীর্তিনগর বালিকা বিদ্যালয়)। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে সঞ্জীব কোঁয়ার ও অনুপম চট্টোপাধ্যায় (গুসকরা পি. পি. ইন্স) এবং বিজিতের সম্মান লাভ করে বনানী ঘোষ ও সোমা চট্টোপাধ্যায় (হাটকীর্তিনগর বালিকা বিদ্যালয়)। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর 'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার' শীর্ষক আলোচনায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করে সুশান্ত লাহা (এরুয়ার বি. এম. ডি. পি)

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

ভারত সরকার ঘোষিত জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী দপ্তর এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানপ্রেমী সংস্থাদের সহযোগিতায় বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। গৃহীত পরিকল্পনায় রয়েছে—বিজ্ঞান পদযাত্রা, বিজ্ঞানের নাটক, কবিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এ ছাড়া সারা রাতব্যাপী আকাশ পর্যবেক্ষণের কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে।

বজবজ চারু-কারু শিল্প ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী ও এক্সপ্লোরারস ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার (বজবজ শাখা) যৌথ উদ্যোগে গত 3রা জানুয়ারী হতে 10ই জানুয়ারী পর্যন্ত সপ্তাহব্যপী বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী হলে চারু-কারু শিল্প এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন, কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র মণি সান্যাল। রবীন্দ্র ভারতীর আর্কিটেক জয়দেব কর্মকার, শরৎ সদনের আর্কিটেক তাপস সেন এবং একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। 'প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, হাততালির শব্দের সাহায্যে সুইচ অন-অফ হওয়া। সুশান্ত আদকের বৈদ্যুতিক মজার বাড়ি মডেলটি, ছায়ার সাহায্যে আলো জ্বালা, সুকুমার দাসের বৈদ্যুতিক অটোমেটিক রোড লাইটের মডেলটি, ক্যানসার ও মাদক দ্রব্যের পরিণতির উপর ভিত্তি করে আঁকা অসীম করের দুটি মূল্যবান তৈলচিত্র, কবি ও সাহিত্যিক তেজেশ অধিকারী আবিষ্কৃত ব্যাটবলহীন রিডিং ক্রিকেট খেলা এবং এ্যান্টি ড্রাগস ও মাদকতার বিরুদ্ধে গণচেতনামূলক সেমিনার। এ ছাড়াও উক্ত প্রদর্শনীতে আবৃত্তি, বসে আঁকো, নাটক ও তথ্যচিত্র অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষে এসব খবর জানিয়েছেন **সমর মণ্ডল**।

জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান রচনা প্রতিযোগিতায় রাজ্যস্তরে প্রবন্ধ রচনায় দুজন ও সৃজনশীল রচনায় দুজন পুরস্কৃত হয়েছেন।

প্রবন্ধ রচনা	সৃজনশীল রচনা
1. শ্রী অপূর্ব সাহা	1. অমিতাভ গায়েন
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ	সালকিয়া হিন্দু হাইস্কুল
পোঃ বিবেকানন্দনগর,	পোঃ সালকিয়া, হাওড়া
পুরুলিয়া	
2. শ্রী উৎপল চক্রবর্তী	2. অমিতাভ দত্ত
পান্নালাল ইনসটিটিউশন	মহিষাদল রাজ হাইস্কুল
পোঃ কল্যাণী, নদীয়া	পোঃ মহিষাদল, মেদিনীপুর

স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

গ্রন্থসূচী : সায়েন্স ক্যুইজ ● গণিত ক্যুইজ ● নলেজ ক্যুইজ ফিজিক্স ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ● লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

লেখকসূচী : অমরনাথ রায় ● অরূপরতন ভট্টাচার্য ● অলক চক্রবর্তী ● তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে
৬টি বইয়ের
সেট ৫০.

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL 9

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১৫ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম : 4·00 টাকা।